৮.১৪ ঈগলের গহ্বরে বনহুর – Bangla Library

৮.১৪ ঈগলের গহ্বরে বনহুর – Bangla Library

ঈগলের গহ্বরে বনহুর –১৩৪

বনহুর তার সাবমেরিন নিয়ে ডুবন্ত জাহাজ ঈগলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দুপাশে গভীর নীলাভ জলরাশি। নানা ধরনের জলীয় জীব সাবমেরিন দেখে ভীত-আতঙ্কিতভাবে পালিয়ে যাচ্ছে। ওরা মনে করছে ওটাও একটা জীব তাদেরই মত, হয়তো তাদের চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর।

বনহুরের জাহাজে উল্কায় বসে দেখছে রহমান ও নূরী। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আরও কয়েকজন অনুচর এবং জাহাজ উল্কার বিদেশী ক্যাপ্টেন মহাথরো। মহাথরো শুধু ক্যাপ্টেন নয়, সে একজন দক্ষ বৈজ্ঞানিকও।

মহাথরো সুইচ টিপছিলো।

সম্মুখস্থ টেলিভিশন ক্যামেরা দ্বারা টেলিভিশন পর্দায় স্পষ্ট ফুটে উঠছিলো সাগরতলের ছবি। বনহুরের সাবমেরিনটা ছিলো অদ্ভুত ধরনের। একটা জলজীবের মত কতকটা। সামনে দুটি চোখের আকারে কাঁচের আবরণ, যা দিয়ে বনহুর সাগরতলে সব কিছু দেখে নিচ্ছে। চোখের আকারে কাঁচের আবরণে ঢাকা বিস্ময়কর ছিদ্রপথ দুটির নিচেই একটি ছোট্ট টি, ভি পর্দা, পাশে দুটি সুইচ। বনহুর সেই টি, ভি পর্দায় ডুবন্ত জাহাজ ঈগলের তলদেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বনহুরের মুখে মুখোস এবং অক্সিজেন পাইপ। সম্মুখে নানা ধরনের মেশিন ও যন্ত্র। সাবমেরিন বেগে চলছিলো। ক্ষুদে টেলিভিশনটি গডসের ভূগর্ভকক্ষ থেকে তুলে এনেছিলো বনহুর। ওটার মধ্যে ঈগলের অভ্যন্তরে সব দেখতে পাচ্ছে সে।

জাহাজ উল্কার নিকট হতে বেশ কয়েক মাইল দূরে সাগরবক্ষে ডুবন্ত ঈগল কান্দাই সাগরের মোহনায়।

ঈগলের তলদেশে একটি খোলের মধ্যে আটকে আছে জাভেদের সাবমেরিন। সংজ্ঞাহীন জাভেদের দেহটা সাবমেরিনের মধ্যে কাৎ হয়ে আছে। প্রচন্ড জলস্রোতে সাবমেরিন সহ জাভেদের দেহটা দোল খাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার কাছে পৌঁছতে না পারলে তার মৃত্যু অনিবার্য। মুখে অক্সিজেন পাইপটা এখনও পরা আছে, তাই ভরসা, হয়তো বা জাভেদ প্রাণে বেঁচে আছে।

নূরীর উদ্বেগ ও উল্কণ্ঠাভরা মুখখানা মনে পড়ছে বনহুরের। হয়তো নূরী এতক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। তার সঙ্গেই আসতে চেয়েছিলো সে। বনহুর জানে ঈগলের গহ্বরে প্রবেশ করলে বেরিয়ে আসা ভীষণ কঠিন, ফিরে আর নাও আসতে পারে সে। তবুও ভীত নয় সে কারণ জাভেদকে উদ্ধার করতে না পারলে......ভাবতে পারে না বনহুর।

কান্দাই সাগর পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎসাগরগুলোর একটি। বিশাল এ সাগর। প্রচন্ড প্রচন্ড ঢেউ সাগরবক্ষে মাতালের মত ছুটাছুটি করে। কত পাহাড় এ সাগরতলে আত্নগোপন করে আছে তার হিসেব কেউ জানে না। এ সাগরে আছে হাঙ্গর, কুমির আর বিরাট আকার তিমি-এ ছাড়া আছে ভয়ংকর ভয়ংকর জল জীব।

বনহুর তার সাবমেরিন অত্যন্ত সাবধানে চালিয়ে নিয়ে চলেছে যেন কোনো ডুবন্ত পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বিনষ্ট হয়। তবে সহজে এ সাবমেরিন বিধ্বস্ত হবার নয়, অত্যন্ত কঠিন মজবুতভাবে তৈরি এটা।

কান্দাই সাগরতলে যখন বনহুরের সাবমেরিন এগিয়ে চলেছে, তখন অপরদিকে একটি ডুবুজাহাজ এগিয়ে আসছে জাহাজ ঈগলের দিকে।

উল্কা থেকে দেখতে পেলো বৈজ্ঞানিক ক্যাপটেন মহাথরো। জোড়া ভ্রুকুঞ্চিত হলো তার। বললো মহাথরো-রহমান, শুধু আমরাই ডুবে যাওয়া বিধ্বস্ত ঈগল নিয়ে ভাবছি না, অন্য কেউও ঈগল নিয়ে ভাবছে। কোনো একটি দল ঈগলের পেছনে লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। সর্দার তার সাবমেরিন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ঈগলের দিকে। ঐ দেখো অপর একটি ডুবুজাহাজ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে আসছে……

হাঁ, আমরাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মহাথরো। কথাটা বললো রহমান। তার গলায় একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়লো।

নূরীর মুখমন্ডল বিধ্বস্ত হলো। আবার নতুন এক বিপদ এগিয়ে আসছে। কারা ওরা…….

ডুবুজাহাজের ভেতরে নানা ধরনের মেশিন আর যন্ত্রপাতি। সম্মুখ ক্যাবিনে কয়েকজন মুখোসপরা লোক। কেউ মেশিন চালাচ্ছে, কেউ সুইচ টিপছে, এ জাহাজের অভ্যন্তরেও টেলিভিশন পর্দার মত একটি নতুন ধরনের পর্দা আছে। ঐ পর্দায় অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে। ডুবুজাহাজখানায় যে ব্যক্তিরা কাজ করছিলো তাদের শরীরে ছিলো লৌহবর্ম। অদ্ভুত সেই ড্রেসগুলো। ওরা জাহাজ ঈগলের সন্ধান পেয়ে ছুটে আসছে, ওরা জানতো ঈগলের গহ্বরে কোটি কোটি টাকার সম্পদ। বহু মূল্যবান পাথর লুকানো ছিলো জাহাজ ঈগলের খোলসের এক গহ্বরে। জাহাজ বোঝাই মাল যেতো বিদেশে এবং সেই মালামালের পরিবর্তে বিদেশ থেকে আসতো মূল্যবান সামগ্রী যা এদেশে পাওয়া যেতো না।

ডুবন্ত জাহাজখানার মালিক বর্মণ সিং।

কান্দাইয়ের অদূরে গোথুলা দ্বীপের অধিবাসী এই বর্মণ সিং। সে ভয়ংকর জলদস্যু। কান্দাই শহরে বহু যাত্রীবাহী জাহাজে তারা হামলা চালিয়ে হত্যা এবং লুটতরাজ করেছে। তাদের একটি ঘটি আছে কান্দাই সাগরে আর একটি গোথুলায়।

বর্মণ সিংয়ের গোথুলা ঘাঁটি শুধু ঘটিই নয়, একটি অস্ত্র কারখানা বলা যায়। নানা ধরনের যন্ত্রপাতি এবং মারাত্নক অস্ত্র তৈরি হয় গোথুলায়। দ্বীপ হলে কি হবে, বহু পাহাড় পর্বত রয়েছে এ দ্বীপে। একটি পর্বতের গুহায় ছিলো বর্মণ সিংয়ের অস্ত্রকারখানা। পৃথিবীর কোনো মানুষ জানে না এই দ্বীপে এমন একটি বিরাট অস্ত্রকারখানা আছে।

মিঃ বর্মন কৌশলে ব্যবসার নাম করে অস্ত্র তৈরীর যন্ত্রপাতি আনতে নানা দেশ থেকে। অস্ত্র তৈরি হলে সে ঐ অস্ত্রগুলো বিভিন্ন দেশের কাছে মোটা অংকে বিক্রি করতো। বর্মণ পৃথিবীর বুকে নিজের আসন তৈরি করে নিচ্ছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি হওয়ার জন্য। সমস্ত বিশ্বে যেন তার নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ে। যদিও সে এখন নিজকে গোপন রেখে অসৎ কাজে লিপ্ত আছে।

ঈগলের সন্ধান মিঃ বর্মণ জানতো।

তার ডুবুজাহাজটির অভ্যন্তরে ছিলো একটা অদ্ভুত মেশিন। জাহাজে বসেই বর্মণ সন্ধান পেতো কোন জাহাজে কি ধরনের মালামাল কান্দাই সাগর দিয়ে অন্য দেশে যাচ্ছে।

সেই অদ্ভুত মেশিনটা ছিলো একটি মাকড়সার জালের মত। ঠিক যেন মাকড়সার জাল, তার উপরে মাঝামাঝি বসে আছে একটি বৃহদাকার মাকড়সা। মাকড়সাটি সব সময় এক একটি জালের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে যেন। ব্রোঞ্জের তৈরি এই মাকড়সার জাল এবং মাকড়সাটি। তার নিচে তলদেশে আছে বিস্ময়কর চাবিকাঠি। আপন ইচ্ছায় মাকড়সা হাঁটছে তার গতিসীমার মধ্যে। মাঝে মাঝে মাকড়সাটি এ রেখা থেকে ও রেখায় পারাপার হয়ে যাচ্ছে! রেখার মধ্যে স্থানে স্থানে ছুটাছুটি করছে। সে মুহূর্তে লাল গোলক চিহ্নের ওপর গিয়ে স্থির হচ্ছে। তখন মিঃ বর্মণ বুঝতে পারে এখন সাগরবক্ষে জাহাজটি কোন স্থানে এসে পৌঁছেছে এবং তাতে কোন ধরনের মালামাল আছে। মিঃ বর্মণ তার ঘাটিতে বসেই ওয়্যারলেসে ডুবুজাহাজে সংবাদ পৌঁছে দিয়ে ঘাঁটির টেলিভিশন ক্যামেরা দ্বারা টেলিভিশন পর্দায় দেখতে এবং পথের নির্দেশ দিতো। কিভাবে কাজ করবো এবং মালামাল লুটে নিয়ে কিভাবে ডুবুজাহাজে তুলে নেবে সেটাও নির্দেশ দেয় সে।

কান্দাই সাগরে প্রায় লেগেই আছে জলদস্যুর আক্রমণ। কোথা থেকে কিভাবে জলদস্যু যাত্রীবাহী জাহাজ এবং মালবাহী জাহাজগুলোতে হামলা চালাতো টের পেতো না পুলিশমহল। এইভাবে সাগরবক্ষে চলতে নির্মম হত্যালীলা আর

লুটতরাজ। বনহুর অবশ্য কিছুটা জানতে কিন্তু ব্যস্ততার কারণে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি।

ডুবু জাহাজখানা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

বিরাট তিমি আকারের মিঃ বর্মণের জাহাজখানা যখন কোন জাহাজে আক্রমণ চালানোর জন্য গভীর জলরাশির তলদেশ দিয়ে অগ্রসর হয় তখন যাত্রীবাহী বা মালবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেন বা চালক কেউ বুঝতে পারে না কোনো শত্রু তাদের জাহাজে আক্রমণ চালানোর জন্য এগিয়ে আসছে। হতভাগ্য জাহাজ নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলে তার গন্তব্যস্থানের দিকে। তারা বুঝতে পারে তখন যখন তাদের জাহাজের তলদেশ ফেঁসে দেওয়া হয় অথবা জাহাজের তলায় বাধার সৃষ্টি করে জাহাজখানার চলৎশক্তি রোধ করা হয়। তারপর লাইফবয় নিয়ে ভেসে উঠে জলদস্যুগণ আক্রমণ চালায় ভীষণভাবে।

বনহুর এই ভয়ংকর জলদস্যু মিঃ বর্মণ সম্বন্ধে তার অনুচরদের মুখে শুনেছিলো। আজ সেই বর্মণের ডুবুজাহাজ তার নজরে ধরা পড়ে যায়। বুঝতে পারে বনহুর এই ডুবুজাহাজখানা বিধ্বস্ত ঈগলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর তার গতি মন্থর করে নিয়ে মিঃ বর্মণের ডুবুজাহাজখানার দিকে অগ্রসর হলো।

বর্মণের ডুবুজাহাজ যেন বুঝতে না পারে এই কারণে বনহুর তার সাবমেরিন আরও গভীরে নিয়ে গেলো। জলীয় উদ্ভিদ আর ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সাবধানে সাবমেরিন নিয়ে এগুতে লাগলো ডুবুজাহাজটির তলদেশের দিকে।

ওদিকে নূরীর মুখমন্ডল বিষণ্ণ হলো, ভীষণ একটা ভয়ার্তভাব পরিলক্ষিত হলো দু'চোখে। বললো নূরী-রহমান ভাই, হুর এ ডুবুজাহাজটিকে লক্ষ করে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছে তার উদ্দেশ্য?

হাঁ পেরেছি।

তুমি নিষেধ করে দাও। ওয়্যারলেসে বলে দাও রহমান ভাই।

কি বলব? তোমার আমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝে সর্দার। তবে এ সময় তার অন্যদিকে মন দেওয়া হয়তো ঠিক হবে না। কারণ জাভেদ যেভাবে ঈগলের

গহ্বরে আটকে আছে তাতে আগে তাকে উদ্ধার করাই একান্ত দরকার।

নূরী ওয়্যারলেসে মুখ রেখে বললো–দুর, তোমার সাবমেরিন ফিরিয়ে নাও... ফিরিয়ে নাও...আমার জাভেদকে উদ্ধার করাই এখন তোমার প্রধান কর্তব্য...

বনহুর বুঝতে পারলো নূরী উল্কায় বসে সব লক্ষ করছে।

বনহুরের মুখের পাশেই সাবমেরিনের ওয়্যারলেস মেশিন। সে নূরীর জবাবে বললো–ঘাবড়াবার কিছু নেই। নিশ্চয়ই ডুবুজাহাজখানা ঈগলের গহ্বরে প্রবেশ করবে...

...ততক্ষণে জাভেদ বেঁচে থাকবে তো?...

....এ ব্যাপারে এখন কিছু বলা যাচ্ছে না...আমি ঠিক ডুবুজাহাজটির তলদেশ বিনষ্ট করতে সক্ষম হবো...ঐ জাহাজটির উদ্দেশ্য মন্দ...

...তুমিও যদি বিপদগ্রস্ত হও?...

...রহমান জানে, উল্কায় এমন যন্ত্র আছে যা তুমি জানোনা। ইচ্ছা করলে ডুবন্ত ঈগলকে উল্কা টেনে নিতে পারতো...কিন্তু তাতে জাভেদের ক্ষতি হতো...আমার মনে হচ্ছে জাভেদ বেঁচে আছে। এরপর বনহুরের আর কোনো কথা শোনা গেলো না। বনহুর এবার তার সাবমেরিনটা ভীষণ বেগে চালু করে দিলো।

সম্মুখের পর্দায় জলরাশি প্রবল বেগে কাঁপছে। বনহুরের সাবমেরিন আর নজরে আসছে না ঠিকমত। নূরী বললো–শিগগির তুমি উল্কা নিয়ে এগিয়ে চলো। নিশ্চয়ই হুর বিপদে পড়েছে। তুমি উল্কা ছাড়ার নির্দেশ দাও...

কিন্তু সর্দারের মানা আছে।

আমি তার মানা শুনতে চাই না রহমান ভাই! আমি নিজে উল্কা ছাড়ার নির্দেশ দিলাম।

রহমান উল্কা ছাড়ার জন্য উল্কার ক্যাপটেন মহাথরোকে নির্দেশ দিলো। মহাথরোও এই নির্দেশের অপেক্ষা করছিলো, কারণ ঈগলের সন্নিকটে উল্কাকে

নিতে পারলে জাভেদকে তার সাবমেরিনসহ তুলে আনা সম্ভব হবে। মহাথরো দক্ষ ডুবুরীও বটে।

একবালে মহাথরো কাজ করতে বিদেশী এক জাহাজে। তখন তার বয়স কম ছিলো, প্রথমে কুলির কাজ তারপর নাবিকের পদ লাভ করে সে একদিন। এরপর ভাগ্য তাকে পথ প্রদর্শন করে। কোনো এক সাইক্লোনে তাদের জাহাজ বিধ্বস্ত হয়। ভেসে যায় জাহাজের মালামাল এবং ক্যাপ্টেন-নাবিক ও কুলি শ্রমিক সবাই। তরুণ নাবিক মহাথরোর যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখলে সে বেঁচে আছে এবং একটি ক্যাবিনে শায়িত। বুঝলো কোনো জাহাজের ক্যাবিন হবে এটা। চোখ খুলে চাইতেই অদ্ভুত পোষাকপরা দুজন লোককে মহাথরো দেখতে পেয়েছিলো সেদিন। পরে জেনেছিলো, যে জাহাজে সে স্থান পেয়েছে ওটা এক ডুবুরীদের জাহাজ। মহাথরোকে ওরা ডুবুরীর কাজ শেখাতে লাগলো। অন্যান্য ডুবুরীর সঙ্গে চললো তার সাগরতলে ডুবুরীর মহড়া। মহাথরো সুনাম করলো ডুবুরীর কাজে।

মাঝে মাঝে ডুবুরী সর্দার জর্দান ফিরোর ডাক আসতো সাগরতলের সন্ধান কাজে। মহাথরা তখন দক্ষ ডুবুরী, সর্দার জর্দান তাকেই কাজে নিয়োগ করতো এবং অন্য সকলে সহকারী হিসাবে তাকে সহায়তা করতো। এভাবে এক সময় বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিং-এর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিং নতুন এক আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলো। তার নতুন এবং বিস্ময়কর আবিষ্কার হবে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক সৃষ্টি।

মহাথরা গোপনে পালিয়ে এলো ডুবুরীদের জাহাজ থেকে বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিংয়ের জাহাজে। সাগর তার সঙ্গীসাথী, তাই মহাথরো সাগরের বুকেই তার জীবনের পট পরিবর্তন ঘটিয়ে চললো।

বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিং এই দুঃসাহসী যুবককে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। তার প্রচেষ্টা এবং সাধনা ছিলো সে এমন একটা মেশিন আবিষ্কার করবে যে মেশিন দিয়ে গভীর সাগরতলায় কোথায় কি কেমনভাবে আছে বা কি ঘটছে সব যেন তার নিজ জাহাজে বসে দেখতে পায়। এই বিস্ময়কর ক্যামেরা মেশিন তৈরি করে ভাস্কর সিং বিশ্ববাসীকে আশ্চর্য করে দেবে।

দীর্ঘ আঠারো বছর বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিং-এর সহকারী হিসাবে কাজ করার পর সফলতা এলো। ক্রমে মহাথরো নিজেই একজন সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলো ভাস্কর সিং এর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে।

ভাস্কর সিং যদি মহাথরোকে সহকারী হিসাবে না পেতো তা হলে হয়তো তার প্রচেষ্টা সার্থক হতো না। এমন একটা সৃষ্টি সত্যি বিস্ময়কর বটে! মেশিনটি চুম্বক লৌহ আর স্বর্ণ দ্বারা তৈরি, এ ছাড়াও আছে পুরু কাঁচ আর ইস্পাত। বহু পরিশ্রমের সফল সেই বিস্ময়কর ক্যামেরা। জাহাজে মেশিনের সামনে বসে সুইচ টিপলেই আশ্চর্যভাবে একটির পর একটি বা জ্বলত আর নিভতো। তার সঙ্গে হ্যান্ডেল ঘোরাতে বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিং। সঙ্গে সঙ্গে সামনে টেলিভিশন পর্দায় পরিস্কার দেখা যেতো সমুদ্র তলদেশ। অপর একটি হ্যান্ডেল টেনে দিলে প্রসারিতভাবে দেখা যেতো সমুদ্র তলদেশ, হ্যান্ডেল দ্বারা সেই বিস্ময়কর মেশিনটার কার্যপদ্ধতি পরিচালিত হতো এবং মহাথরোর সহযোগিতায়ই এই অদ্ভুত মেশিন তৈরি সম্ভব হয়েছিলো।

এ সংবাদ বনহুরের কাছে অজ্ঞাত থাকে না, কৌশলে বনহুর নিজ প্রয়োজনে তুলে এনেছিলো মহাথরোকে বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিংয়ের জাহাজ থেকে।

বনহুরকে এ ব্যাপারে বেশ চিন্তাভাবনা করতে হয়েছিলো। উড়ন্ত সসার ধার করতে হয়েছিলো বনহুরকে দস্যুরাণীর কাছ থেকে। সেদিনের কথাও মহাথরো ভোলেনি আজও।

গভীর রাত।

ভাস্কর সিং আর মহাথরো তাদের কাজের শেষে নিজ নিজ ক্যাবিনে ঘুমিয়ে ছিলো।

হঠাৎ মহাথরোর ঘুম ভেঙে গেলো।

দেখলো তার পাশে দন্ডায়মান এক জমকালো মূর্তি।

মহাথরো প্রথমে মনে করলে হয়তো সে স্বপ্ন দেখছে। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো স্বপ্ন। নয় সত্য। মহাথরো বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে ভালভাবে লক্ষ করতেই জমকালো মূর্তি বললো–ভয় নেই, আমি তোমাকে সদ্য মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করতে এসেছি। মহাথরো তুমি আজ সার্থক বৈজ্ঞানিকরূপে সার্থকতা লাভ করেছে। বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিং বুঝতে পেরেছে তুমি তাকে পরাজিত করেছো……থামলো জমকালো মূর্তি, তারপর বললো–একই বনে দুই সিংহ বাস করতে পারে না। কাজেই বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিং তোমাকে সরিয়ে ফেলার অভিসন্ধি করছে।

কে তুমি! মিথ্যা কথা, ভাস্কর সিং আমাকে তার জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসে।

হাঁ, সে কথা সত্য তবে এখন সে তোমাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করছে এবং সেই কারণেই তোমার জীবননাশের ষড়যন্ত্র করছে। এসো আমার সঙ্গে, তুমি নিজের কানে সব শুনবে এসো।

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত মহাথরো জমকালো মূর্তির সঙ্গে পা বাড়ালো।

অদূরেই ছিলো বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিংহের ক্যাবিন।

জমকালো মূর্তি মহাথরো সহ ক্যাবিনের শার্শীর পাশে এসে দাঁড়ালো। জাহাজের একটানা ঝকঝক শব্দের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে একটা বিস্ময়কর পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। ক্যাবিনের ভেতরে বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিং এবং জাহাজের ক্যাপ্টেনের কথাবার্তা চলছে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

শোনা গেলো বৈজ্ঞানিক ভাস্কর সিংয়ের গলা-ক্যাপ্টেন, আমার নির্দেশ তুমিই এ কাজ সমাধা করবে। কারণ আমি অন্য কাউকে বিশ্বাস করি না।

কিন্তু আমি মহাথরোর বুকে হোরা বসাতে পারবো না।

পারবে, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি এবং তোমার ওপর আমার ভরসা আছে।

ক্যাপ্টেনের গলা-স্যার, আমি তাকে কৌশলে হত্যা করবো। তাকে জাহাজের মেশিনরুমে মেশিন পরীক্ষা করে দেখার জন্য নামিয়ে দেবো, তারপর ওপর থেকে মেশিন চালিয়ে দেবো……

বাহবা! সত্যি তোমার বুদ্ধি আছে ক্যাপ্টেন…….

জমকালো মূর্তি বললো–শুনলে মহাথরো, তোমাকে নিয়ে তোমার শিক্ষাগুরুর অভিসন্ধি কি? শুনলে তো

মহাথরোর তখন স্তব্ধ মুখে কোনো কথা ছিলো না। অন্ধকার ছিলো তাই ওর মুখখানা স্পষ্ট দেখতে না পেলেও জমকালো মূর্তি বুঝতে পারলো মহাথরোর মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। সে ভাবতেই পারেনি বৈজ্ঞানিক ভাস্কর তাকে হত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিজের কানকে যেন সেদিন বিশ্বাস করতে পারেনি

মহাথরো। যেখানে সে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেছে, কোনো সময় কর্তব্যে ফাঁকি দেয়নি সেখানে সে পেলো চরম আঘাত। শুধু আঘাত নয়, সেখানে নেই তার জীবনের নিরাপত্তা। কৌশলে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা তার জন্য সমীচীন নয়। বললো মহাথরো-কে তুমি? আর তুমি আমার সম্বন্ধে এতসব জানলেই বা কেমন করে।

আমি তোমার বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষীও বটে! আমি দস্যু বনহুর!

তুমি, তুমি দস্যু বনহুর?

হা। চলে এসো আমার সঙ্গে, সব বলবো তোমাকে।

কিন্তু এ জাহাজে তুমি এলে কি করে?

তুমি একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছো, তুমি অনুমান করতে পারো এখানে আমি কেমন করে এলাম। কিন্তু তুমি যখন আমাকে চেনোই তখন এ কথা জানো আমার অসাধ্য কিছু নেই। মহাথরো, আমি তোমাকে জোরপূর্বক তুলে নিতে এসেছিলাম অথচ তার প্রয়োজন হলো না। আমি এই জাহাজে অবতরণ করার পর কোন ক্যাবিনে তুমি আছো সন্ধান করতে গিয়ে তোমার শিক্ষা গুরুর ক্যাবিনের পাশে পৌঁছে যাই। শুনতে পেলাম এ ক্যাবিনে কোন শলা-পরামর্শ হচ্ছে। ভালভাবে কান পেতে শুনে চমকে উঠলাম, তোমার শিক্ষাগুরু তোমাকে অচিরেই সরিয়ে দেবার চিন্তাভাবনা করছে। তখন তোমার খোঁজ করে তোমার ক্যাবিন আবিষ্কার করলাম। তারপর সবই তো তুমি জানো বন্ধু। এসো আমার সঙ্গে।

মহাথরোসহ বনহুর রেলিং বেয়ে জাহাজের ছাদে উঠে গেলো।

অবাক হলো মহাথরো। সে একটি চক্রাকার বস্তু দেখতে পেলো। ঐ বস্তুটির ভেতরে একটি ছোট্ট নীলাভ আলোর বল জ্বলছে।

বনহুর চক্রাকার বস্তুটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তারপর একটি বোম টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি দরজার মত ফাঁক সৃষ্টি হলো। ঐ ফাঁকে বনহুর আর মহাথরো চক্রাকার বস্তুটির মধ্যে প্রবেশ করলো।

ভেতরে প্রবেশ করার পরপরই আপনা আপনি ফাঁকটি বন্ধ হয়ে গেলো। স্বল্প আলোতে মহাথরো দেখলো পাশাপাশি দুটি আসন। একটি আসনে বনহুর তার জমকালো পোষাক পরিহিত অবস্থায় বসলো, অপরটিতে মহাথরোকে বসার জন্য ইংগিত করলো।

মহাথরোর জীবন বৈচিত্র্যময়, কাজেই সে এতটুকু ঘাবড়ালো না, বরং তার উৎসাহ বাড়লো, নতুন এক সৃষ্টির বিস্ময়কর পরিবেশ অনুপ্রাণিত করলে তাকে বৈজ্ঞানিক মহাথরোর মনে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। দরজা বা ফাঁকটি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর অক্সিজেন পাইপের সুইচ অন করে দিলো। অপর একটি সুইচ টিপতেই চক্রাকার বস্তুটি শূন্যে উড়ে উঠলো এবং তার মধ্যে জ্বলে উঠলো একটি গভীর নীলাভ আলোর ছটা।

মুহূর্তে আকাশের উপরে আরও উপরে উঠে এলো চক্রাকার বস্তুটা। বনহুর বললো–আমি তোমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি, তুমি কি তাই চাও?

মহাথরো শান্তকণ্ঠে বললো–হ বনহুর! মহাথরোর চোখ দুটোতে বিস্ময় ও আনন্দ ঝরছে।

বনহুর নিজের মুখের আবরণ উন্মোচন করে দক্ষিণ হাতখানা বাড়িয়ে দিলো মহাথরোর দিকে।

করমর্দন করলো মহাথরো বনহুরের সঙ্গে।

এরপর থেকে মহাথরো বনহুরের পাশে বন্ধুরূপে এবং তার একজন বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে রয়ে গেছে। বনহুরের ভালবাসার মধ্যে মহাথরো পেয়েছে গভীর আন্তরিকতা। মহাথরো বনহুরের সান্নিধ্য পেয়েছে হয়েছে ধন্য!

সেই থেকে মহাথরো রয়ে গেছে জাহাজ উল্কায়।

বনহুরের উল্কাতেই শুধু নয়, তার আস্তানাতেও যেতে হয় মহাথরোকে। নানা ধরনের মেশিন তাকেই দেখাশোনা করতে হতো। যদিও বনহুর নিজেও একজন দক্ষ বৈজ্ঞানিকের চেয়ে কম ছিলো না তবুও এসব কাজের জন্য তার সময় কত থাকতো, তাই বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগর প্রতিমুহূর্ত প্রস্তুত থাকতো, কখন কি প্রয়োজন সেই কাজ করার জন্য। এরাও বনহুরের এক একজন বিশ্বস্ত অনুচর।

অবশ্য যে কাজ এদের দ্বারা সম্ভব হতো না সে কাজ বনহুর নিজেই করতো।

ঈগলের গহ্বরে জাভেদের উদ্ধার কাজ মহাথরোই করবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, সেই মুহূর্তে বনহুর স্বয়ং ফিরে আসায় সে নিজেই অতিদ্রুত এগিয়ে এলো সাগরতলে যাওয়ার জন্য।

নূরীর মুখ বিষণ্ন হয়ে উঠেছে, না জানি নতুন আর এক বিপদ এসে বনহুরের সামনে তার গতিপথ রুদ্ধ করলো! বনহুরের সাবমেরিন বেগে এগিয়ে যাচ্ছে গভীর সাগরের তলদেশ দিয়ে। তার লক্ষ্য ডুবুজাহাজটিকে ঘায়েল করা।

মহাথরো তার ক্যামেরার বোম দ্রুত টিপে চলেছে।

টেলিভিশন পর্দায় সাগরতলসহ বনহুরের সাবমেরিনের গতিপথ ভালভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাবমেরিনটার চলার পথে নানা ধরনের জলীয় উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন প্রকারের জলজীব দেখা যাচ্ছে। এমন কি বিস্ময়কর হাঙ্গর, বিরাটকায় তিমি আর বৃহৎ আকার কচ্ছপ ছাড়াও আশ্চর্যজনক নানা জীব নজরে পড়ছে।

সাবমেরিন এত দ্রুতবেগে এগুচ্ছে যে, তার আঘাতে কতকগুলো বৃহদাকার জলজীব ঘায়েল হচ্ছে এবং মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। তারপর ধীরে ধীরে কাৎ হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে গভীর অতলে।

অদ্ভুত আর ভয়ংকর এ দৃশ্য!

ডুবুজাহাজখানা সাগরতল দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ঈগলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন পরিচালনা করছে জাহাজখানাকে। তার সামনে আশ্চর্যজনক তীব্র পাওয়ারফুল বাইনোকুলার, এই বাইনোকুলার গভীর জলরাশি ভেদ করে ঈগলের ভগ্ন অংশগুলো তুলে ধরছিলো ডুবুজাহাজের ক্যাপ্টেনের চোখে! তার কানে ওয়ারলেসের সাউন্ড বক্স আটকানো, বর্মণ তার ঘাঁটি থেকে পথের নির্দেশ ক্যাপ্টেনকে দিচ্ছিলো।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন শুনতে পেলো বর্মণের গলা ক্যাপ্টেন, তোমার জাহাজের অদুরে একটি সাবমেরিন দ্রুত এগিয়ে আসছে, মুহূর্ত বিলম্ব করো না, ডুবুজাহাজটিকে ধ্বংস করে দেবার জন্যই এগুচ্ছে সাবমেরিনটা। তুমি ডুবুজাহাজের হিংছং মেশিনের সুইচ টিপে দাও……সাবমেরিনটা হিং ছং-এর দাতে আটকা পড়ে বাষ্ট

হয়ে যাবে......বিলম্ব করো না, একদম কাছাকাছি এসে পড়েছে ঐ সাবমেরিনটা......।

বনহুর জানতো না ডুবুজাহাজটার চারপাশে একটা অদ্ভুত ধরনের মেশিন আছে। কোন হাঙ্গর বা তিমি মাছ আক্রমণ করলে ঐ দাঁত মেশিনটা চালু করে দেওয়া হয়। যে কোনো জীব আক্রমণ চালালেই দাঁতের মত ধারালো মেশিনে আটকা পড়ে যেতো আর প্রাণ হারাতে। ভীষণ মজবুত এবং কঠিন এই অদ্ভুত মেশিন। ডুবুজাহাজটার চারপাশে ঘেরাও করা ছিলো এই ভয়ংকর মেশিন দিয়ে।

ক্যাপ্টেন সজাগ হলো এবং তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে দিলো সেই ভয়ংকর মেশিনের। সঙ্গে সঙ্গে ডুবুজাহাজের চারপাশে হিংছং তার দাঁত মেলে দিলো। এমন কোনো বস্তু নেই যা এই হিং ছং মেশিনে আটকা পড়ে বেরিয়ে যায়।

রহমান, নুরী আর মহাথরো ডুবুজাহাজের গায়ে এই ভয়ংকর ধারালো বুলন্ত দাঁতগুলো দেখতে পেলো। তারা বুঝতে পারলো সাবমেরিনটাকে ওরা দেখতে পেয়েছে এবং তা বিধ্বস্ত করে ফেলার জন্য এ ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। রহমান ওয়্যারলেসে তাড়াতাড়ি বনহুরকে জানিয়ে দিলো ব্যাপারটা।

বনহুর এবার তার সাবমেরিনের গতি মন্থন করে নিয়ে আরও গভীর তলদেশে সাবমেরিনটাকে নামিয়ে নিলো, তারপর স্পীডে এগিয়ে চললো। মাত্র কয়েক মিনিট, বনহুরের সাবমেরিন ডুবু জাহাজের গভীর তলদেশ দিয়ে নিচে গিয়ে প্রচন্ড আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে ডুবুজাহাজখানার তলা ফেঁসে গেলো এবং ভীষণ শব্দে বিধ্বস্ত হলো। ততক্ষণে বনহুরের সাবমেরিন বেরিয়ে এসেছে বিপরীত দিকে।

ডুবুজাহাজটির তলায় খোলর মধ্যে ছিলো বেশকিছু পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য। বনহুরের সাবমেরিনের সুঁচালো অগ্রভাগের প্রচন্ড আঘাতে ডুবুজাহাজটির তলায় লৌহনির্মিত পাতে ছিদ্র সৃষ্টি হওয়ায় অগ্নি প্রজ্বলিত হয় আর সেই অগ্নির দ্বারা বিস্ফোরণ দ্রব্যে আগুন ধরে যায়। মুহূর্ত দেরি হয় না জাহাজটি বিধ্বস্ত হতে। সে কি প্রচন্ড শব্দ। সাগরতলে জলরাশি ভীষণভাবে আলোড়িত হলো, তোলপাড় হলো যেন গোটা পৃথিবী।

নূরী দু'হাতে নিজের চোখ ঢেকে ফেললো, চিৎকার করে বললো–রহমান ভাই, তোমাদের সর্দার আর বেঁচে নেই......সেই সাবমেরিনে মৃত্যুবরণ করেছে......।

মহাথরো আর রহমান নিশ্চুপ।

এমন যে ঘটবে তারা ভাবতেও পারেনি।

সাগরতলে এমন বিস্ফোরণ ইতিপূর্বে তারা কোনোদিন দেখেনি। সমস্ত বিশ্বজগৎ যেন খন্ডবিখন্ড হয়ে যাচ্ছে। গভীর জল তলে যে এমনভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত হতে পারে সত্যি বিস্ময়কর।

ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ আর জলরাশির তোলপাড় যেন থামতেই চায় না। সাগরের তলায় যেন ধ্বংসলীলা সৃষ্টি হয়েছে। ডুবুজাহাজটির খন্ড খন্ড অংশ আকাশচুম্বী জলোচ্ছাসের সঙ্গে আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো চারদিক।

বেশ কিছু সময় ধরে সাগরতলে এই তান্ডবলীলা চললো। নূরী কান্নায় ভেঙে পড়লো। তারপর জাহাজ ঈগলের দিকে টেলিভিশন ক্যামেরা ঘোরাতেই স্পষ্ট নজরে পড়লো ঈগলের কাছাকাছি বনহুরের সাবমেরিন ধূম্রজাল ভেদ করে এগিয়ে আসছে।

নূরী আনন্দধ্বনি করে উঠলো-সাবাস হুর! সাবাস, তুমি জয়ী হয়েছো! রহমান ভাই, দেখো হুর তার সাবমেরিন নিয়ে বেরিয়ে এসেছে.....

রহমান আর মহাথরো উচ্ছল আনন্দে আত্মহারা হলো।

রহমান বললো–আমি জানতাম সর্দার ধ্বংস হবে না। তার প্রতি আল্লাহর মেহেরবানি আছে।

মহাথরো বললো–সাগরতলে ধূম্ররাশির আকৃতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। জমাট মেঘের মত মনে হয় তার সঙ্গে ছিলো জাহাজটির খন্ডবিখন্ড অংশ-এসবের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো সর্দারের সাবমেরিনখানা, তাই আমরা শক্তিশালী টেলিভিশন ক্যামেরায়ও দেখতে পারিনি।

হাঁ, মহাথরো, তোমার অনুমান সত্য। বললো রহমান।

তারা কথা বলছিলো কিন্তু তাদের দৃষ্টি ছিলো সামনের টেলিভিশন পর্দায়। তারা দেখতে পেলো বনহুর তার সাবমেরিনসহ প্রবেশ করেছে নিমজ্জিত ঈগলের

অভ্যন্তরে। ঈগলের বিধ্বস্ত দেহটার মধ্যে সাবমেরিন নিয়ে প্রবেশ করা কঠিন তবুও বনহুর কৌশলে প্রবেশ করলো এবং মুখে অক্সিজেন পাইপ এটে নেমে পড়লো সাবমেরিন থেকে। সাঁতার কেটে এগুলো বনহুর জাহাজটির যে অংশে আটকে ছিলো জাভেদসহ তার বিধ্বস্ত সাবমেরিনখানা সেদিকে। সামনে একটি বিরাটকায় ভাসমান লৌহপাত কাৎ হয়ে আছে। বনহুর সাগরতলে গভীর জলরাশির মধ্যে ভাসমান অবস্থায় লৌহপাতটি অতি সাবধানে সরিয়ে পথ করে নিলো। তারপর দেখলো একটি বৃহকায় ভগ্ন লৌহ পাইপ জাহাজটির তলদেশ বেষ্টন করে আছে। বনহুর তার সাবমেরিনের মধ্য হতে একটি করাতের মত যন্ত্র বের করলো, তা দিয়ে সুকৌশলে পাইপগুলোর কিছু অংশ কেটে ফেললো, তারপর সরিয়ে ফেললো অনায়াসে। এবার বনহুর ঈগলের ধ্বংসস্তূপ থেকে জাভেদকে তার সাবমেরিনের আসন হতে বের করে আনলো এবং ভাসমান অবস্থায় কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঈগলের গহ্বর থেকে।

নিজ সাবমেরিনে জাভেদের সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিয়ে পুনরায় সাবমেরিনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিধ্বস্ত ঈগলের গহ্বরে প্রবেশ করলো। তারপর বহু পরিশ্রম করে ঈগলের তলদেশে খোলের মধ্যে ঢুকে পড়লো, বনহুর জানে খোলর তলায় কোনো এক স্থানে স্মাগলার গডসের অন্য মালামালের সঙ্গে আসছিলো কোটি কোটি টাকার এক সম্পদ। ঈগল বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদ জানতে পেরে মিঃ গডসে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো। উম্মাদ হয়ে পড়েছিলো সে। নিশ্চয়ই সেই সম্পদ অমূল্য কোনো বস্তু তাতে সন্দেহ নেই।

অবশ্য বনহুর যা আন্দাজ করেছে তা সত্য-মিঃ বর্মণ তার গোথুলা দ্বীপে বসে জানতে পেরেছিলো মিঃ গডসের জাহাজ যে সম্পদ বহন করে আনছে তাতে রয়েছে বহু মূল্যবান কোনো সম্পদ। মিঃ বর্মণ যখন ঈগলে হানা দিয়ে সেই মহামূল্যবান সম্পদ লুটে নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, ঐ সময় কান্দাই সাগরের বুকে বিধ্বস্ত হয় ঈগল। মিঃ বর্মণকে তার ব্রোঞ্জের মাকড়সা জানিয়ে দেয় ঈগলের চরম দুরবস্থার কথা। কোনো জাহাজ যদি সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হয় তখন মাকড়সার ভেতর থেকে আশ্চর্যজনক শব্দ বের হতে থাকে।

মিঃ বর্মণ বুঝতে পারে, যে জাহাজটিকে মাকড়সা ফলো করছিলো সেই জাহাজখানা বিপদগ্রস্ত হয়েছে। মিঃ বর্মণ তার টেলিভিশন ক্যামেরায় দেখতে পায় ঈগলের পরিণতি এবং সেই মহামূল্য সম্পদ হস্তগত করার আশায় তার ডুবুজাহাজের ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দেয়। ডুবুজাহাজের ক্যাপ্টেন ছাড়া নাবিক ও

ডুবুরী ছিলো সাতজন। তারা মিঃ বর্মণের বিশ্বস্ত দাস, প্রচুর অর্থের লোভে তারা প্রতিমুহ ত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করতো। কেউ যদি তার নির্দেশ পালনে অসমর্থ হতো তাহলে তাকে হিংছং মেশিনের দাতে পিষ্ট করে হত্যা করা হতো।

এ কারণে তাদের মৃত্যুভয় ছিলো, পালিয়েও পরিত্রাণ পেতো না তারা। মিঃ বর্মণের অনুচরগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আত্মগোপন করে থাকতো। উদ্দেশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থা জানা, আর সেই কারণেই মিঃ বর্মণ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। আর এজন্যই গোথুলা দ্বীপে বেছে নিয়েছিলো অস্ত্রাগার তৈরির স্থান হিসেবে। সফল হয়েছিলো মিঃ বর্মণ অস্ত্রাগার স্থাপনে।

লোকচক্ষুর অন্তরালে মিঃ বর্মণ তার অস্ত্রাগার স্থাপন করে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছিলো পারমাণবিক তার অস্ত্র তৈরি সাধনায়। তার অস্ত্রাগারটি ছিলো গোথুলা দ্বীপের একটি পর্বতের পাদমূলে। হঠাৎ কেউ দেখলেও বুঝতে যেন না পারে সেখানে গভীর মাটির তলায় বিরাট স্থান জুড়ে স্থাপন করা হয়েছে বিশ্বধ্বংসী অস্ত্র তৈরির কারখানা। উপরিভাগ দেখলে মনে হয় পর্বতের একটি চূড়া বা শৃঙ্গ। জমাট ধূম্ররাশি বেরিয়ে যাওয়ার যে পাইপ ছিলো সেটার মুখ ছিলো কান্দাই সাগরের তলদেশে এবং সেই পাইপের মুখ সাগরবক্ষের ওপরে ভাসমান অবস্থায় ছিলো। সাগরের এ অঞ্চলে জাহাজ চলাচল তেমন ছিলো না। কোনোক্রমে কোনো জাহাজের ক্যাপ্টেন বা নাবিক যদি এই ধাবমান পাইপের ধূম্ররাশি দেখে ফেলতো এবং অনুসন্ধান চালানোর জন্য অগ্রসর হতো তাহলে মিঃ বর্মণের দল জাহাজটিকে কৌশলে জলমগ্ন করতো, লুটে নিতে ঐ জাহাজের মূল্যবান সামগ্রী।

এ জায়গাটায় লুটতরাজ হয় বলে কোনো জাহাজের ক্যাপ্টেন অথবা নাবিক ভুল করেও সাগরের এদিকে আসতো না। মিঃ বর্মণের দলে ছিলো পনেরো জন সদস্য। এরা বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দা। মিঃ বর্মণ ছিলো এদের অধিনায়ক।

মিঃ বর্মণ তার ডুবুজাহাজ ইথলা বিধ্বস্ত হওয়ায় যদিও ভীষণ আঘাত পেলো কিন্তু মুষড়ে পড়লো না। এমন ধরনের বিপদের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত রয়েছে মিঃ বর্মণ। ইথলের শেষ পরিণতি এত ভয়াবহ হবে তা ভাবতেই পারেনি মিঃ বর্মণ। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ইথলার জন্ম, এবং সুদীর্ঘ সময় ইথলা সাগর তলে ডুবুজাহাজ হিসেবে কাজ করে এসেছে। আজ সেই ইথলার অবস্থা বড় করুণ, দুঃখজনক। হারিয়ে গেলো ইথলা সাগরতলে, আর কোনোদিন তার উদয় হবে না। শুধু ইথলাই হারিয়ে যায়নি, তার সঙ্গে মিঃ বর্মণ হারালো তার বিশ্বস্ত দক্ষ

ক্যাপ্টেন আর ছয়জন দক্ষ নাবিককে। যারা ইথলার পরিচালক হিসেবে মিঃ বর্মণকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে এসেছে। শত শত জাহাজে হামলা চালিয়ে লুট করে এনেছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ। আর সেই সম্পদ দিয়ে মিঃ বর্মণ গড়ে তুলেছে তার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কারখানা বা অস্ত্রাগার।

ইথলার ধ্বংস মিঃ বর্মণকে বিচলিত করলেও সে ধৈর্যচ্যুত হলো না, গোঙ্গুলার ঘাটিতে বসেই সে তার ক্যামেরায় বিধ্বস্ত ঈগলের গহ্বরে লক্ষ করছিলো। বনহুর যখন ঈগলের গহ্বরে থেকে জাভেদকে উদ্ধার করে পুনরায় ঈগলের তলিয়ে যাওয়া খোলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো তখন মিঃ বর্মণ বুঝলো এই ব্যক্তিই তার ইথলার ধ্বংসের মূল। ঈগলের অভ্যন্তরে সে কিছুর সন্ধান করছে। ইথলার প্রয়োজনীয়তা এই মুহূর্তে বর্মণ দারুণভাবে উপলব্ধি করছে। ঈগলের গহ্বরে যে সম্পদ রয়েছে তা উদ্ধার করতে হলে দরকার ছিলো ইথলার এবং ঐ ডুবুরীদের যারা নিহত হয়েছে ইথলার ভেতরে।

কিন্তু এইসব নিয়ে ভাববার সময় নেই মিঃ বর্মণ ও তার পার্টনারদের। তাদের দৃষ্টি এখন বিধ্বস্ত ঈগলের দিকে। টেলিভিশন পর্দা থেকে ফটো ওঠানো হচ্ছে পাশের ক্যামেরা কাজ করছে ছবি ওঠানোর।

বনহুরের মুখে অক্সিজেন পাইপ মুখোশ থাকায় তাকে চেনা সম্ভব হচ্ছে না মিঃ বর্মণের। কে এই ব্যক্তি যার ক্ষমতা অসীম ভয়ংকর দুঃসাহসী না হলে সে ইথলার মত বৃহদাকার ডুবুজাহাজ ধ্বংস করতে সাহসী হতো না। এই ব্যক্তি শুধু ডুবুরীই নয়, দুর্ধর্ষ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও সুকৌশলী। কিন্তু কে এই ব্যক্তি...... মিঃ বর্মণ তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললো–মিঃ ক্যাথো, মিঃ জং জিং লোমা, মিস হ্যানরী গ্রীমা আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন এ ব্যক্তি সাধারণ নয় এবং সে যে-কোনো অসাধ্য সাধনে সক্ষম।

হাঁ, আপনার অনুমান সত্য। ঈগলের গহ্বরে যে সম্পদ আছে তা উদ্ধারের আশায় লোকটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যেমন করে থোক লোকটাকে আমাদের চাই......কথাগুলো বললো মিঃ ক্যাথেগো।

মিঃ জং জিং লোমা বললো–এই ধরনের দুঃসাহসী ব্যক্তি আমাদের দরকার আছে। ওকে বন্দী করে আনা দরকার।

মিস হ্যানরী গ্রীমা বললো–আপনাদের কথাগুলো আমার মনমত হয়েছে মিঃ লোম। ঐ ব্যক্তি যেই হোক আর যে দেশেরই বাসিন্দা হোক ওকে পেলে মন্দ হবে না। আমরা ওর দ্বারা অনেক কঠিন কাজ সমাধা করে নিতে পারবো।

মিঃ বর্মণ বললো–আমি ওর কার্যকলাপ লক্ষ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি! তবে যতক্ষণ ওকে কঠিন শাস্তি দিতে না পারছি ততক্ষণ আমি স্বস্তি পাবো না। ইথলার ধ্বংস আমার জীবনে চরম আঘাত হেনেছে। আমি মুষড়ে পড়ছি......।

যখন গোথুলায় বসে সব লক্ষ করছিলো মিঃ বর্মণ ও তার সঙ্গীরা তখন বনহুর ঈগলের খোলের মধ্যে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ খোলের মধ্যে একটি ছোট্ট খুপড়ি আবিষ্কার করলো বনহুর, প্যান্টের পকেট থেকে দ্রুত বের করলো একটি ধারালো ছোট্ট যন্ত্র। যন্ত্রটি দ্বারা অতি সহজেই খুলে ফেললো খুপড়িটা। খুপড়িটা খুলতেই তার মধ্যে উজ্জ্বল দীপ্ত কয়েকটা পাথর বের হলো। গভীর সাগরতলায় পাথরগুলো তারকার মত দপ দপ্ করে জ্বলছে।

বনহুর পাথরগুলো একনজর দেখে নিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে তুলে নিলো প্যান্টের পকেটে।

মিঃ বর্মণ ও তার সহকারীরা দেখলো, তাদের চোখে মুখে একটা লালসাপূর্ণ ভয়ংকর ভাব ফুটে উঠলো। তাদের ইথলার ডুবুরিগণ ঐ অমূল্য সম্পদ উদ্ধার করার জন্যই সুকৌশলে যাচ্ছিলো বিধ্বস্ত ঈগলের দিকে। ডুবুজাহাজ ইথলার তলদেশে ছিলো বহু অর্থ ব্যয়ে সঞ্চয় করে আনা পারমাণবিক শক্তিশালী বোমা তৈরির বারুদ এবং মসলা। এসব নিয়েই ইথলা ঈগলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। কিন্তু সমূলে ধ্বংস হলো ইথলা।

বনহুর জাভেদকেই শুধু উদ্ধার করলো না, উদ্ধার করলো বিধ্বস্ত ঈগলের গহ্বরে মিঃ গডসের বহু সাধনার ও কামনার সম্পদ। কোটি কোটি টাকার মালামালের বিনিময়ে তারা আনতে পেরেছিলো সেই পাথরগুলো যার জন্য জীবন হারালো গডসে এবং তার সঙ্গীসাথীরা।

*

বনহুর ফিরে এলো আস্তানা।

জাভেদ পুনর্জীবন লাভ করলো। সেদিন বনহুর যদি ঠিকসময় পৌঁছতে সক্ষম না হতো তাহলে জাভেদ মৃত্যুবরণ করতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নূরীর মনে আনন্দ ধরে না।

স্বামী-পুত্রকে ফিরে পেয়েছে-এ যে তার কত আনন্দ তা বোঝাতে পারে না নুরী কাউকে। আস্তানায় আনন্দ উৎসব চলছে। খানাপিনার অভাব নেই, আস্তানার একাংশে পাক হচ্ছে বড় বড় ডেকচিতে মাংস, পোলাও জরদা সব রকম রান্না হচ্ছে।

বনহুর দরবারকক্ষে বসেছে, এতদিনের কাজকর্মের হিসেব নিকেশ গ্রহণ করছে সে। দরবারকক্ষে সব অনুচর উপস্থিত, যারা রান্নাবান্নার কাজে আছে তারা ছাড়া সবাই আছে সেখানে।

আজকের এই মহা আনন্দ উৎসবের আয়োজন করছে নূরী। তাই স্বামী দরবারকক্ষে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত থাকলেও নূরী আজ সেখানে নেই। নূরীর কাজ আজ উৎসবকে সুন্দর করে তোলা।

জাভেদ তার নিজ গুহায় শুয়েছিলো।

যদিও সে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি তবুও পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল। একা একা ভাবছিলো সে হয়তো দূরের কথা। জাভেদ যখন জানতে পেরেছিলো নূর তার ভাই তখন থেকে তার প্রতি জাভেদের একটা আকর্ষণ এসেছিলো মনে। অদ্ভুত সে আকর্ষণ, প্রাণের টানে ছুটে যেতো জাভেদ কান্দাই শহরে এবং অশ্বটিকে বনহুর কোনো গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে হেঁটেই চলে নূরের ডাকবাংলোর কাছাকাছি। কোনোদিন দারোয়ান তাকে প্রবেশ করতে দিতো, কোনোদিন দিতো না। যেদিন নূরকে দেখতে পেতো সেদিন মন তার ভরে উঠতে আনন্দে। আর যেদিন নূরের সাক্ষালাভ ঘটতো না সেদিন বিষণ্ন মনে ফিরে আসতো সে।

অশ্বপৃষ্ঠে বসে হয়তো বা চলে যেতে পাহাড়ে, নয়তো গভীর জঙ্গলে। পাহাড়ের পাদমূলে বসে ভাবতো কত কি! জঙ্গলে সে বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে। বন্য জীবজন্তু নিয়েই তার ছোটবেলা কেটেছে। বনহুর যেমন ব্যাঘ্র শিশু বা সিংহশাবক

নিয়ে খেলা করতো তেমনি স্বভাব ছিলো জাভেদের। বনহুরের চেহারা এবং স্বভাবের সঙ্গে যেমন মিল ছিলো নূরের, তেমনি জাভেদের।

এমন কোনো দুঃসাধ্য কাজ ছিলো না যা অসাধ্য ছিলো বনহুরের কাছে। তবে জাভেদ আর নূরের কার্যকলাপে ছিলো অনেক পার্থক্য। নুর যেমন শিক্ষাদীক্ষায় একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তেমনি জাভেদ দুর্ধর্ষ কার্যকলাপে পিতার মত দুঃসাহসী হয়ে গড়ে উঠেছে। বনহুর অথবা রহমান জাভেদকে কোনোক্রমেই লেখাপড়া শেখাতে পারেনি। এজন্য নূরীর আক্ষেপ ছিলো। জাভেদ কারও কথা শুনতে না বা কিছু মানতো না। সে কথা বলতো নিতান্ত কম, নিজ শরীরের প্রতিও তার তেমন খেয়াল ছিলো না। অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলো জাভেদ। ভয় বলে তার কিছু ছিলো না। নূরী সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলো ছোট্টবেলায়, তাই জাভেদকে শিখিয়েছিলো একটু আধটু কিন্তু জাভেদ তা হয়তো ভুলেই গেছে। এখন।

জাভেদ শুয়েছিলো আপন মনে কি যেন ভাবছিলো।

এমন সময় ফুল্লরা প্রবেশ করে সেখানে।

ফুল্লরা চুপি চুপি পা টিপে জাভেদের পাশে এসে দাঁড়ালো। তার হাতে ছিলো একটি বন্য ফুল। ফুলটা জাভেদের বুকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললো–জাভেদ!

জাভেদ চোখ তুলে তাকালো, কোনো কথা বললো না।

ফুল্লরা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো, অভিমানভরা কণ্ঠে বললো–জাভেদ, তোমার কি কোনো সময় আমার কথা মনে হয় না?

জাভেদ কোনো উত্তর দেয় না।

ফুরা বললো–জানো, তোমার জন্য আমি আল্লাহর নিকটে কত প্রার্থনা করেছি। অহরহ তোমার কথা স্মরণ করে আড়ালে বসে কেঁদেছি......বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে ফুল্লরার গলা।

জাভেদ তার শয্যায় অর্ধশায়িতভাবে উঠে বসে, অবাক হয়ে তাকায় সে ফুল্লরার মুখের দিকে, তারপর বলে-কেঁদেছে আমার কথা স্মরণ করে? কেন কেঁদেছে?

ফুল্লরা চুপ থাকতে পারলো না, বললো–তুমি কি কিছু বোঝে না জাভেদ? তুমি কি একেবারে ছেলেমানুষ

আমি তো বুঝতে পারছি না কেন তুমি আমার জন্য কাদো?

সে তুমি বুঝবে না জাভেদ! তুমি একটা প্রাণহীন পাথর।

আমি পাথর।

হাঁ, তুমি পাথরের চেয়েও কঠিন বস্তু। তুমি কোনোদিন আমার কথা ভাবো না। কিন্তু আমি যে তোমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণি। যখন শুনলাম ঈগলের গহ্বরে তোমার প্রাণহীন দেহ দেখা গেছে, সেদিন আমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিলো তুমি বুঝবে না জাভেদ……

ফুল্লরা।

বলো?

তুমি আমাকে ভালবাসো?

এ কথা কি তুমি নতুন করে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে জাভেদ?

তোমার মধ্যে কি কোনো অনুভূতি নেই? আরও বহুবার তোমাকে আমি এ কথা বলেছি। আমি তোমাকে আমার জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসি জাভেদ। তোমার যদি মৃত্য ঘটতে তাহলে আমিও সাগরের পানিতে নিজেকে বিসর্জন দিতাম। তোমার জন্যই তো আমি বেঁচে আছি।

সত্যি তুমি আমাকে খুব ভালবাসো?

হাঁ।

আমি যা বলবো তাই করতে পারবে?

পারবো জাভেদ, যা তুমি বলবে তাই করতে পারবো। যদি তুমি আমার হৃৎপিন্ড চাও তাই দেবো তোমাকে।

ফুল্লরা, তাহলে আমি অনেক দিন থেকে যা ভাবছি তাই করবে?

করবো, করবো, এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি করবো।

তুমি তো জানো আমার বড় ভাই নূর তোমাকে ভালবাসে।

ফুল্লরার মুখে একরাশ বেদনা ও বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো।–অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ফুল্লরা জাভেদের মুখের দিকে। জাভেদ কি বলতে চায়! ফুল্লরা নির্বাক।

জাভেদ সোজা হয়ে বসলো, তারপর স্বাভাবিক গলায় বললো–নূরকে তোমার বিয়ে করতে হবে।

আর্তনাদ করে উঠলো ফুল্লরা-জাভেদ, এ তুমি কি বলছো।

তুমি বলেছো আমি যা বলবো তাই তুমি করবে।

বলেছি......তাই বলে তুমি আমাকে এমন কথা বলতে পারলে তোমার হৃদয়-মন কিছু নেই আমি জানতাম তবুও ভাবতাম তুমি আমাকে ভালবাসো।

হাঁ, ভালবাসি।

ভালবাসো, এটা তারই প্রমাণ? এই তোমার ভালবাসা?

নূর তোমার ভালবাসা পেতে চায়। ফুল্লরা, তুমি যদি ওকে বিয়ে করো তাহলে আমিও তোমাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসবো। ভালবাসবো ফুল্লরা......

না

তোমার কথা তুমি তো রাখলে না ফুল্লরা? আমার গায়ে হাত রেখে তুমি শপথ করেছে যা বলবো তাই করবে?

জাভেদ, তুমি জানোয়ারের চেয়েও নিষ্ঠুর।

এবার জাভেদ পিতার মত হেসে উঠলো, তার হাসির প্রতিধ্বনি আস্তানার পাথরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে গুমরে উঠলো। বললো জাভেদ–জানোয়ারের

চেয়েও নিষ্ঠুর আমি। হৃদয় বলে আমার কিছু নেই ফুল্লরা। আমার ভালবাসা তোমাকে আনন্দ দেবে কিন্তু সুখী করতে পারবে না।

না, আমি কোনো কথা শুনবো না। আমি কাউকেই বিয়ে করবো না। একটু থেমে বললো ফুল্লরা-ছোটবেলা থেকেই আমি তোমার মঙ্গল চেয়েছি......তোমার জয় চেয়েছি......তুমি যেন সর্দারের মত সর্বশ্রেষ্ঠ এক মানুষ হও......কেউ যেন তোমাকে পরাজিত করতে না পারে......এই ছিলো আমার কামনা। আর তারই বিনিময়ে তুমি আমাকে অপরের হাতে সমর্পণ করতে চাও?

জাভেদ শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো।

আজকের উৎসবে আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। বনহুর আর নূরী বারবার জাভেদের সন্ধান আর খোঁজ পেলো না।

এখানে বনহুরের আস্তানায় যখন উৎসব চলছিলো তখন জাভেদ তার অশ্বপৃষ্ঠে কান্দাই শহর অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে। তার অশ্ব যখন কান্দাই জঙ্গল পেরিয়ে শহরের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো তখন একটি পুলিশ ভ্যান সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। জাভেদ তাদের দৃষ্টিতে পড়ে যায়।

পুলিশ প্রধান নির্দেশ দেন, গুলী ছোড়ো, নিশ্চয়ই কোনো দস্যু বা ডাকু হবে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী জাভেদকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো।

জাভেদ অশ্বচালনায় দক্ষ। সে উল্কাবেগে অশ্বচালনা করে চললো।

পুলিশ ভ্যানখানা তাকে অনুসরণ করলো।

জাভেদের অশ্ব ছুটছে।

অশ্ব ঘুরিয়ে বনপথ ধরে এগুচ্ছে জাভেদ।

পুলিশের ভ্যানখানাও তার পিছু ধাওয়া করলো। মাঝে মাঝে গুলী ছুঁড়ছে পুলিশবাহিনী। তারাও ভ্যানখানাকে খুব স্পীডে চালাচ্ছে। যদিও বনপথ পরিষ্কার নয় তবুও তারা গাড়ির গতি ভীষণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

অবিরাম গুলীও চালাচ্ছে পুলিশ।

হঠাৎ একটি গুলী জাভেদের বাঁ হাতের বাজুতে বিদ্ধ হলো। ক্ষণিকের জন্য জাভেদ অশ্ব নিয়ে থমকে দাঁড়ালো। পর পর আরও কয়েকটি গুলী চলে গেলো তার পাশ কেটে।

অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে পুলিশবাহিনীর ভ্যানখানা।

জাভেদের অশ্ব ততক্ষণে একটি বিরাট খাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। নিচে গভীর খাদ, বড় বড় পাথরের খন্ড পড়ে আছে, তার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোত জলধারা। জাভেদ তাকিয়ে দেখে নিলো মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলো তার গুলীবিদ্ধ হাতের যন্ত্রণা। পেছনে ছুটে আসছে পুলিশ ভর্তি ভ্যান। পুলিশবাহিনীর হাতে উদ্যত গুলীভরা রাইফেল।

আর কিছুটা এগুলেই পুলিশের গুলী তার দেহভেদ করে চলে যাবে, কাজেই আর বিলম্ব না করে জাভেদ তার অশ্বসহ খাদের ওপাশে লাফিয়ে পড়লো।

পুলিশপ্রধান হতভম্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। একটা তরুণ তার এত সাহস আর শক্তি! তার দেহে গুলীও বিদ্ধ হয়েছে তবুও সে এমনভাবে তাদের কবল থেকে নিজকে বাঁচিয়ে নিলো।

পুলিশ ভ্যানখানা খাদের সন্নিকটে পৌঁছে থেমে পড়তে বাধ্য হলো। কারণ একচুল এগুলেই গভীর খাদের মধ্যে তাদের গাড়িখানা পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। পুলিশবাহিনীর মাথাগুলো থেতলে গুঁড়িয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গাড়িখানা খাদের ওপাশে নেওয়ার কোনো উপায় ছিলো না।

কান্দাই পর্বতময়দেশ।

সাগর নদনদী এবং পাহাড়-পর্বতে ভরা রয়েছে গভীর অরণ্য ও বনবাদাড়। গভীর জঙ্গলে বাস করে বর্বর জংলী জাতি। এরা কোনো সময় গভীর জঙ্গল ছেড়ে বাইরে আসে না। কাঁচা মাংস ওদের প্রিয় খাদ্য, গাছের ফলমুল খেতে ওরা ভালবাসে।

কান্দাই জঙ্গলে জংলীরা প্রবেশ করতে সাহসী হয় না, কারণ তারা দস্যু কালুখার নামে ভীষণ ভীত ছিলো। একবার যুদ্ধ বেঁধেছিলো জঙ্গলীদের কালু খাঁর সঙ্গে। তাতে জঙ্গলীরা পরাজিত হয়েছিলো কালু খাঁর কাছে। সেই হতে কান্দাই

জঙ্গলের ধারেকাছেও ওরা আসে না, হীরাঝিলের ওপারে ছিলো জাংহা জঙ্গল, ঐ জঙ্গলেই জঙ্গলীরা থাকতো।

খাদ পেরিয়ে জাভেদের অশ্ব ছুটলো জাংহা জঙ্গল অভিমুখে।

পুলিশবাহিনী বিমুখ হয়ে ভ্যান নিয়ে ফিরে চললো তাদের গন্তব্যস্থান অভিমুখে।

এদিকে বনহুরের আস্তানায় খানাপিনা আর আনন্দ উৎসব চলেছে। বনহুর ও নূরী জানে জাভেদ বড় খেয়ালী, হয়তো সে মনের খেয়ালে কোথাও বেরিয়ে গেছে, কারণ রহমান সন্ধান নিয়ে জেনেছে জাভেদের অশ্বটিও অশ্বশালায় নেই। তখন তারা বুঝতে পেরেছে জাভেদ একা যায়নি তার প্রিয় অশ্বকে নিয়েই সে গেছে।

জাভেদের অশ্বটিও ঠিক তাজের মত। যেমন শক্তিশালী তেমন তেজী, জমকালো তাজের মতই গায়ের রং। জাভেদ অশ্ব আর তাজের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিলো না, শুধু জাভেদের অশ্বের চোখের নিচের অংশে ছিলো সাদা রেখার মত কিছুটা লোম।

জাভেদ উৎসবে যোগ না দেওয়ায় ফুল্লরার হৃদয় ব্যথায় বেদনায় মুষড়ে পড়ছিলো। সেও উৎসবে যোগ দিতে পারলো না।

*

নূরের ঘুম ভেঙে গেলো।

একটা শব্দ তার কানে প্রবেশ করলো, কেউ তার জানালার শাশী খোলার চেষ্টা করছে বলে মনে হলো। জানালার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। স্বপ্ন নয় সত্য-জানালার শাশী নড়ছে, তবে কি কেউ ওপাশে আছে। নূর টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করে নিলো তার পিস্তলখানা।

ডান হাতে পিস্তল উদ্যত করে ধরে বাঁ হাতে জানালার শাশীর ছিটকানি খুলে ফেললো-কে তুমি?

কক্ষের স্বল্প আলোতে নূর দেখতে পেলো কে যেন রেলিং-এর উপর দাঁড়িয়ে আছে। নূর পিস্তলখানা প্রস্তুত করে ধরে বললো–কে তুমি বলো, নইলে গুলী ছুঁড়বো।

আমি জাভেদ! স্পষ্ট অথচ চাপা কণ্ঠস্বর।

জাভেদ! জাভেদ তুমি বেঁচে আছো?

হাঁ। শার্শীর খিল খুলে দাও নূর।

নূর বিলম্ব না করে করে শাশীর খিল খুলে দিলো। শাশীর ছিটকানি খুললেও লৌহশিকলের আবরণ ছিলো, কেউ প্রবেশে সক্ষম হবে না এ পথে। খিল খুলতেই লৌহকপাট দু'পাশে সরে গেলো, জাভেদ প্রবেশ করলো সেই পথ দিয়ে কক্ষে।

সুইচ টিপে লাইট জ্বালালো নূর।

জাভেদের জামাকাপড় রক্তে ভেজা। চেহারার মধ্যেও একটা উদভ্রান্তভাব। নূর চমকে উঠলো। জাভেদকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিয়ে সে বললো–জাভেদ, তোমার এ অবস্থা কেন? প্রহরী কি গুলী ছুঁড়েছিলো তোমাকে লক্ষ্য করে?

না।

তবে তোমাকে কে এভাবে গুলীবিদ্ধ করেছে।

তোমার কাছেই আসছিলাম কিন্তু পথে পুলিশবাহিনী আমাকে দেখে ফেলে এবং তারা যে ভ্যানে যাচ্ছিলো, সেটা নিয়েই আমাকে ধাওয়া করে গুলী ছোড়ে। তারই একটি গুলী আমার বাহুতে বিদ্ধ হয়।

তারপর! তারপর জাভেদ

ভ্যান নিয়ে পুলিশবাহিনী আমার পেছনে ছুটলো, আমিও আমার অশ্বের পিঠে ছুটলাম। আমাকে ধরা বা পাকড়াও করা এত সহজ নয়। সামনে একটা খাদ ছিলো আমার অশ্ব অনায়াসে খাদের ওপারে লাফিয়ে পড়লো আর পুলিশবাহিনীর ভ্যানটি খাদের এপারে আটকা পড়লো। আমার অশ্বটা আমাকে নিয়ে ছুটলো।

জাভেদ, তোমার জন্য বড় চিন্তায় ছিলাম। তুমি বাপুর সাবমেরিন নিয়ে ঈগল ধ্বংস করার জন্য কান্দাই সাগরতলে দুঃসাহসিক অভিযান চালালে। ধ্বংস করতে সক্ষম হলে তুমি স্মাগলার গডসের বাহন ঈগলকে। ঈগল বিধ্বস্ত হওয়ার

সংবাদ শোনার পর গডসে এবং তার পার্টনারগণ সবাই মৃত্যু বরণ করেছে তারই গোপন কক্ষে তড়িতাহত হয়ে। কিন্তু তোমার সন্ধান জানতাম না জাভেদ, তুমি বেঁচে আছো-কি যে আনন্দ লাগছে। আমি হাতে ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি। রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে, কাজেই চিন্তার কোনো কারণ নেই।

জাভেদকে শুইয়ে দিয়ে নূর তার ওষুধের বাক্স নিয়ে এলো।

নূর নিজের কাছে নানা ধরনের ওষুধ রাখতো, কারণ কোন মুহূর্তে কি প্রয়োজন হাতের কাছে না পেলে বড় অসুবিধায় পড়তে হয়, তাই সে প্রায়ই তার নিজের ওষুধ ব্যবহার করতো। আজ জাভেদের বেলায় ব্যতিক্রম হলো না। নূর নিজের ওষুধের বাক্স এনে জাভেদের ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে দিলো। তারপর ফ্লাক্সে রাখা গরম পানি ঢেলে দুধ তৈরি। করলে নূর নিজের হাতে, জাভেদকে দুধ খাইয়ে দিলো যত্ন সহকারে।

অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো জাভেদ।

জাভেদ বললো–নূর, আমি কেন এসেছি সে কথা তোমাকে এখনও বলা হয়নি। তুমি কথা দাও আমার কথা রাখবে?

হেসে বললো নূর–বলো রাখব।

জাভেদ স্বাভাবিক গলায় বললো–নূর, তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ভাই। ফুল্লরাকে তুমি ভালবাসো আমি জানি। ভাই বলেই আমি তোমার হাতে তাকে সমর্পণ করতে চাই।

জাভেদ, এ তুমি কি বলছো। আনমনা হয়ে যায় নুর, তন্ময় হয়ে কিছু ভাবে, তারপর বলে-একদিন মেয়েটিকে ভাল লেগেছিলো এখন আর সে মোহ নেই। জাভেদের পিঠ চাপড়ে জাভেদ বললো–আমি ফুরাকে ভালবাসি নূর, কিন্তু ওকে বিয়ে করার জন্য নয়। ওকে ভাল লাগে, তাই ওকে ভালবাসি। একটা ফুলকে মানুষ যেমন ভালবাসে তেমনি।

জাভেদ, তোমার কথা আমি রাখতে পারলাম না। বললো নূর।

তুমি ফুল্লরার জন্য একদিন আমাকে হত্যা করতে গিয়েছিলে নূর?

গিয়েছিলাম।

তবে কেন তুমি আমার কথা রাখতে চাও?

আমি জানি ফুল্লরা তোমাকে ভালবাসে, শুধু ভালই বাসে না তোমার জন্য সে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করবে না। জাভেদ, তুমি ফুল্লরাকে গ্রহণ করো।

না।

কেন?

ফুল্লরাকে তুমি ভালবাসো তাই আমি ওকে তোমার কাছে সঁপে দিতে চাই।

জাভেদ!

হা নূর। তোমার কোনো কথা শুনবো না আমি। যা বলেছি তুমি ভেবে দেখো। আমি আবার আসবো। বলেই জাভেদ যেপথে এসেছিলো ঐ পথে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

নূরের দু'চোখে বিস্ময়। একটু পরেই শুনতে পায় অশ্বপদ শব্দ। অন্ধকার রাত্রির গভীরতা ভেদ করে অশ্ব খুরের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়। নূর বুঝতে পারে জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে। এসেছিলো।

কিছুক্ষণ মুক্ত শাশী দিয়ে তাকিয়ে থাকে নূর জাভেদের চলে যাওয়া পথের দিকে। জমাট কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে অসংখ্য তারার প্রদীপ জ্বলছে। সাঁ সাঁ করে ঠান্ডা বাতাস ছুটে এলো, এবার নূর জানালার শার্শী বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলো। তাকালো সে একটু পূর্বে যে স্থানে বসেছিলো জাভেদ সেই সোফাটার দিকে।

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো নূর, তার মনের আকাশে জাভেদের মুখখানা ভাসছে। কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে জাভেদের কথাগুলো......আমি ফুল্লরাকে ভালবাসি একটা ফুলকে মানুষ যেমন ভালবাসে তেমনি......তুমি ফুল্লরার জন্য একদিন আমাকে হত্যা করতে গিয়েছিলে নূর......ফুল্লরাকে তুমি ভালবাসো তাই আমি ওকে তোমার কাছে সঁপে দিতে চাই......তোমার কোনো কথা আমি শুনবো

না, আমি যা বলেছি তুমি ভেবে দেখো নূর......আমি আবার আসবো.......নূর একদিন ফুল্লরার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো। ওকে প্রথম দেখার পর থেকে নূরের হৃদয়ে ভীষণ একটা আবেগ আর অনুভূতি জেগেছিলো। ফুল্লরাকে একটিবার দেখার জন্য বারবার ছুটে যেতো সে কান্দাই জঙ্গলে। গাড়ি চালিয়ে জঙ্গলের পাশে গিয়ে গাড়ি রেখে ভেতরে প্রবেশ করতো, দূরে ঝরণার পাশে বা কোনো নির্ভূত স্থানে দাঁড়িয়ে ফুল্লরার সন্ধান করতো।

ঝরণার পানিতে সাঁতার কাটতে ফুল্লরা, নূর দূরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতো। ঝরণার মতই, উচ্ছল ফুল্লরা। ওর হাসির বা গানের শব্দ ঝরণার পানিতে আলোড়ন জাগাতো, তেমনি শিহরণ জাগাতো নূরের মনে। পাহাড়িয়া ঝরনা ফুল্লরা, বনফুলের মত সুন্দর!

দূর থেকে ওকে প্রাণভরে দেখতো, তারপর ফিরে আসতে নূর নিজের বাংলোয় একদিন রহমান নূরকে দেখে ফেলে বলে, আশঙ্কায় মনটা তার কেঁপে উঠেছিলো সেদিন। নূর কি তাহলে কান্দাই জঙ্গলে আসে। সে ও কি তাহলে ফুল্লরাকে ভালবাসে। কিন্তু ফুল্লরা আর জাভেদ এরা যে এক, ওরা সঙ্গী দুজনে। একদিন জাভেদ আর নূরের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিলো ফুল্লরাকে নিয়ে। ভীষণ লড়াই-ভাগ্যিস দেখে ফেলেছিলো রহমান তাই রক্ষে। সেদিনের দৃশ্য মনে করে রহমান চিন্তিত হয়েছিলো।

আর আজ জাভেদ নিজে এসেছিলো নূরের নিকটে। ফুলরাকে সঁপে দিতে চায় সে নূরের কাছে। অনেক কথা ভাবে নূর, একসময় ঘুমিয়ে পড়ে সে।

*

উৎসব শেষ হয়ে গেছে।

বনহুর আর নূরী বসেছিলো বনহুরের বিশ্রামকক্ষে।

নূরী বললো–কাল থেকে জাভেদ কোথায় গেছে জানি না। ফুল্লরা গম্ভীর, না জানি কি ঘটেছে ওদের মধ্যে।

জাভেদ ভীষণ আহত, এ সময় তাকে বাইরে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি নরী। ঈগলের গহ্বরে তার মৃত্যুই ঘটেছিলো প্রায়, যদি সময়মত না পৌঁছতাম তাহলে ওকে বাঁচানো সম্ভব হতো না।

তা আমি জানি হুর কিন্তু কি করব বলল, বাপকা বেটা ঠিক তুমি যেমন একগুঁয়ে তেমনি খেয়ালী তোমার ছেলে। ওকি কারও-কথা শোনে? বলো তুমি কোনোদিন শুনেছো আমার কথা?

হয়তো সম্ভব হয়নি তাই……।

তোমার সন্তানও তাই, ওকে কিছুতেই ধরে রাখা যায় না হুর। সত্যি আমি তোমাকে নিয়েই পারি না, তারপর জাভেদ। সব সময় আমি উদ্বিগ্ন থাকি ওর জন্য। জানি না উৎসবের দিন কেন কোথায় চলে গেলো ভেবে পাচ্ছি না। তবে আমার মনে হয় ফুল্লরা জানে জাভেদ কোথায় গেছে।

তুমি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করোনি নূরী?

করেছিলাম কিন্তু কোনো জবাব দেয়নি সে।

বনহুর আর নূরী যখন কথা বলছিলো তখন হঠাৎ রহমান গুহাকক্ষের দরজায় এসে কলো-সর্দার।

এসো! বললো নূরী।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বললো–সর্দার, জাভেদ ফিরে এসেছে।

নূরী আনন্দভরা কণ্ঠে বললো–আমার জাভেদ ফিরে এসেছে রহমান ভাই?

হাঁ, কিন্তু……

বল কিন্তু কি? থামলে কেন বলো রহমান ভাই, কি হয়েছে তার?

পুলিশ তার পিছু ধাওয়া করেছিলো, গুলী ছুঁড়েছিলো তাকে লক্ষ্য করে।

তারপর?

তার বা বাহুতে গুলী বিদ্ধ হয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে।

কোথায় সে? বললো বনহুর।

তার গুহাকক্ষে। বললো রহমান।

নূরী কোনো কথা না বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

জাভেদের কক্ষে প্রবেশ করে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো। নূরী-জাভেদ কোথায় গিয়েছিলো? কিভাবে এমন হলো?

ফুল্লরা জাভেদের পাশে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিলো।

নূরী কক্ষে প্রবেশ করতেই ফুল্লরা উঠে সরে দাঁড়ালো।

নূরী জাভেদের পাশে বসে ক্ষতস্থানের ওপরে হাত বুলিয়ে বলে-এ তোর কি হয়েছে। জাভেদ? এ তোর কি হলো......নূরীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো। দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বললো জাভেদ–এমন কিছু হয়নি আম্মি তুমি কিছু ভেবো না। ফুল্লরা না বুঝে কাঁদছে। তুমিও কাদছো আম্মি?

কাঁদবো না, তোমাদের জন্য আমার চোখের পানি কোনোদিন শুকাবে না। আজ উৎসব হলো আর তুই আস্তানা ছেড়ে পালালি। কত যে দুঃখ পেয়েছি তুই বুঝবি না।

আম্মি, এত ভাবলে চলে! এখন তো আমি ছোট নই তবু কেন এত ভাবো আমার জন্য?

হাঁ, জাভেদ ঠিকই বলেছে নূরী কেন তুমি এতো ভাবো। কথাটা বলে বনহুর জাভেদের শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো।

ফুল্লরা বনহুরকে দেখে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর জাভেদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাধা দেখে বললো–কে এমন করে বেঁধে দিয়েছে। কোনো ডাক্তার হবে হয়তো?

না।

তবে কে?

নূর। বাপু কেন তুমি এতদিন বলোনি নূর আমার ভাই? বলো তুমি কেন বলোনি? নূরকে আমি একদিন হত্যা করতে গিয়েছিলাম। যদি রহমান চাচা সেদিন পরিচয় না দিতে তাহলে......।

জাভেদ, আমি জানতাম সময় হলে আপনা আপনি জানতে পারবে-তাই জেনেছো। বুঝতে পেরেছি নূরের ওখানে গিয়েছিলে এবং যাওয়ার পথে পুলিশ তোমার পিছু ধাওয়া করেছিলো?

হ্যাঁ বাপুজী, তাই সত্য। আর এই ব্যান্ডেজ নূরই বেঁধে দিয়েছে।

বনহুর কিছু ভাবলো, তারপর যে ভাবে এসেছিলো সেইভাবেই বেরিয়ে গেলো।

নূরী ডাকলো-ফুল্লরা, আয় জাভেদের কাছে এসে বস।

ফুল্লরা ধীরে পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করলো। দু'চোখ তার কেঁদে কেঁদে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে।

নূরী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে নীরবে সান্ত্বনা দেয়। তারপর বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

বনহুর রহমানসহ ফিরে আসে দরবার কক্ষে।

রহমান বললো–সর্দার, মূল্যবান পাথরগুলো আমাদের রত্নভান্ডারে রাখা হয়েছে। তবে পাথরগুলো সম্বন্ধে কেউ যদি জেনে থাকে তাহলে চিন্তার কারণ আছে।

চিন্তার কোনো কারণ নেই রহমান, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো। রহমান, একটা ঘটনা আমাকে ভীষণভাবে চিন্তিত করে তুলেছে। ঐ ডুবুজাহাজখানা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগছে।

বলুন সর্দার

আমার মনে হয় কান্দাই সাগরের মোহনার নিকটে কোনো দ্বীপে ঐ ডুবুজাহাজের মালিক বসবাস করে। ঐ ডুবুজাহাজটির খোলর মধ্যে ছিলো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির ফর্মুলাসহ বারুদ। ডুবুজাহাজটির বিস্ফোরণ যেভাবে

ঘটেছিলো তাতে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে, নিশ্চয়ই এর পেছনে আছে গভীর একটা রহস্য।

হাঁ সর্দার, ডুবুজাহাজটির বিস্ফোরণ আশ্চর্যজনক বটে! উল্কায় বসে আমরা সব লক্ষ করেছি। মহাথরাও ঐ রকম সন্দেহ করেছে।

তাহলে এ রহস্য উদ্ঘাটন করা একান্ত প্রয়োজন রহমান। মহাথরোর সঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার। বনহুর তার সামনে রক্ষিত ওয়্যারলেসটা মুখের সামনে তুলে ধরলো। মহাথরোর সঙ্গে কথা হলো কিছুক্ষণ।

বনহুর আর মহাথরোর মধ্যে যখন ওয়্যারলেসে কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন রহমানের মুখমন্ডল বেশ চিন্তাযুক্ত মনে হচ্ছিলো। ক'দিন পূর্বেই সর্দার ফিরে এসেছে। মিশরের পিরামিডের অভ্যন্তরে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো কিন্তু মিশরীয় পুলিশমহল তাকে বন্দী করে রাখতে সক্ষম হয়নি। নানা বিপদের সঙ্গে মোকাবেলা করে সর্দার সবে ফিরেছে, তারপর আবার নতুন এক অভিযানের চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলেছে। না জানি এবার ভাগ্যে কি আছে!

*

মিঃ বর্মণ ও তার সঙ্গীসাথীরা চিন্তিত হলো। তাদের ডুবুজাহাজ ইথলা বিধ্বস্ত হওয়ায় রাগে-ক্ষোভে ওদের শরীরে যেন আগুন ধরে গেছে। টেলিভিশন ক্যামেরা চালু করে বার বার ঈগলের গহ্বরে ডুবুরীর ড্রেস পরিহিত বনহুরকে দেখছিলো, কিভাবে লোকটা ঈগলের গহ্বরে প্রবেশ করলো, কি করে সে ঈগলের গহ্বরে আটকা-পড়া লোকটিকে উদ্ধার করে তার বাহনটির মধ্যে তুলে নিলো, তারপর দুঃসাহসিক অভিযান চালালে বিধ্বস্ত ঈগলের গহ্বরে। সুকৌশলী ডুবুরীর মত সাগরতলে একটি নিমজ্জিত জাহাজের তলদেশে সন্ধান চালিয়ে কিভাবে উদ্ধার করলো মিঃ গডসের সঞ্চিত মূল্যবান পাথরগুলো। কে এই ব্যক্তি। সবার মনে, এই প্রশ্ন, যেমন করে থোক খুঁজে বের করতেই হবে ওকে। আমাদের প্রয়োজন আছে এমনি একজন দুঃসাহসী ব্যক্তির।

মিঃ বর্মণ বললো–মিস গ্রীমা, তোমাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হলো।

মিস গ্রীমার মুখ উজ্জ্বল হলো, সে হেসে বললো–এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ বর্মণ।

মিঃ ক্যাথেগো বললো–গ্রীমার ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারি, কারণ সেও একজন দুঃসাহসী মহিলা। আমার মনে আছে গ্রীমা সেবার হিন্দোল সমুদ্রে একা সাইক্লোনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাসমান স্পীড বোটটিকে মাল-বোঝাই অবস্থায় গোধুলা ঘাঁটিতে পৌঁছে দিয়েছিলো।

হাঁ, বেশ মনে আছে আর সেই কারণেই আমি এই কঠিন দায়িত্বভার তাকে দিলাম। মিঃ বর্মণ কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো।

মিঃ ক্যাম্পেগো বললো–আমাদের প্রধান শক্তিই গ্রীমা....কথাটা বলে গ্রীমার পিঠ চাপড়ে দিলো সে।

গ্রীমার চোখের সামনে ভাসছে তখন সেদিনের কথা। জাহাজভর্তি বারুদ আর পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম আসছিলো। হঠাৎ সাইক্লোন শুরু হয়! সমুদ্রের বুকে শুরু হয় তান্ডবলীলা, প্রচন্ড সে ঝড়। জলের ভীষণ আস্ফালন চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই বুঝি জাহাজখানা ডুবে যায়। প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে জাহাজের ডেকের ওপর। সমস্ত জাহাজ জুড়ে তারা মাত্র সাতজনক্যাপ্টেন, মিঃ ক্যাথেগো, মিঃ জং জিং লোমা, মিস গ্রীমা আর তিনজন নাবিক। জাহাজখানা সাইক্লোনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভবপর নয় বুঝতে পারে তারা। গোথুলা দ্বীপের ঘাঁটি থেকে মিঃ বর্মণ ওয়্যারলেসে সাবধান করে দিচ্ছে, আরও নির্দেশ দিচ্ছেন, জাহাজে যে স্পীডবোট আছে তা আধুনিক উপায়ে তৈরি। মহা প্রলয়ঙ্করী ঝড়েও তা ডুবে যাবে না। মিঃ বর্মণের নির্দেশ মত কিছু মালামাল স্পীড বোটে তুলে নিয়েছিলো জাহাজের নাবিকগণ; তারপর স্পীড বোট নামিয়ে দিয়েছিলো সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে। স্পীড বোটখানা ছিলো, কভারে ঢাকা কাজেই প্রচন্ড ঢেউ ও জলোচ্ছাস স্পীড বোটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। স্পীড বোটখানা চালনার দায়িত্ব নিয়েছিলো মিস গ্রীমা। গভীর সমুদ্রের তান্ডবলীলা স্পীড বোটখানার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। দক্ষ স্পীড বোট চালকের মত সেদিন গ্রীমা ভয়ংকর সাইক্লোন অতিক্রম করে গোথুলায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল।

মিস গ্রীমার আদর মিঃ বর্মণের কাছে বেড়ে গিয়েছিলো এরপর থেকে। মিস গ্রীমাকে বর্মণ জোগাড় করেছিলো আরাকান বিমান বন্দর থেকে। গ্রীমা প্রচন্ড সাগরের ঢেউ আর উত্তালতার মধ্যে দিয়ে স্পীড বোট চালনা প্রতিযোগিতায় বারবার প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্বজয়ী হয়েছিলো। বহু দেশের রাষ্ট্রনায়ক তাকে পদক উপহার দিয়েছিলেন। মিঃ বর্মণ তখন বুঝেছিলো, তার ঘটিতে এমনি

একটি মেয়ের দরকার আছে। মিঃ বর্মণ তাই শ্রীমার নতুন নাম দিয়েছিলো দুঃসাহসী গ্রীমা।

মিস গ্রীমার জন্য গ্রীস দেশে। কৃষক পরিবারে জনেও গ্রীমা অত্যন্ত দুঃসাহসী আর খেয়ালী ছিলো। পৃথিবীর অনেক দেশই সে ভ্রমণ করেছে। হঠাৎ মিঃ বর্মণের নজরে পড়ে যায় মিস হ্যানরী গ্রীমা। তারপর চললো মিঃ বর্মণের প্রচেষ্টা। মিঃ বর্মণ কৌশলে গ্রীমাকে অনুসরণ করলো। যে দেশে যেতে গ্রীমা সেই দেশেই মিঃ বর্মণ তাকে ফলো করতে লাগলো, তারপর একদিন এক বিমান বন্দর থেকে সুকৌশলে অপহরণ করা হলো তাকে।

প্রথমে কিছুতেই হ্যানরী গ্রীমা মিঃ বর্মণের কার্যকলাপ সহ্য করতে পারতো না। তার মুক্ত জীবনে এ বন্দীত্ব মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিলো সেদিন। কিন্তু মিঃ বর্মণ অত্যন্ত সুচতুর ছিলো, সে মিস গ্রীমাকে তার ঘাঁটির নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত করলো।

বেশ কিছুদিনের মধ্যে মিস গ্রীমা নিজকে খাপ খাইয়ে নিলো। তারও ইচ্ছা ছিল কঠিন কাজ বেছে নেওয়া এবং তা সমাধা করা। সে জানতে পারলো যেখানে সে এসেছে সেটা একটা গবেষণাগার। তারপর একদিন জানলো এ গবেষণাগারের মূল উদ্দেশ্য পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা এবং এ অস্ত্র দ্বারা মিঃ বর্মণ একদিন বিশ্বজয়ের চিন্তা করছে।

নতুন এক উন্মাদনা জাগলো তখন মিস হ্যানরী গ্রীমার মনে। বিশ্ব বিজয়ের চিন্তা তাকেও আচ্ছন্ন করলো। একদিন মিস হ্যানরী গ্রীমা বলেছিলো-মিঃ বর্মণ, আপনার পারমাণবিক অস্ত্র দ্বারা আপনি দুনিয়াটাকে ধ্বংস করেই যদি দেন তাহলে দুনিয়া জয় করে কি লাভ হবে?

বলেছিলো সেদিন মিঃ বর্মণ–আমি আর আমার সহকারিগণই শুধু বিচরণ করবো বিশ্বময়। বিশ্বের সমস্ত সম্পদ হবে আমাদের। আমি গোটা দুনিয়াটাকে নাগাসাকি হিরোসিমায় পরিণত করবো। অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলো মিঃ বর্মণ- আমি জয়ী হবোই। মিস গ্রীমা, তুমি ভয় পেও না।

এরপর গ্রীমাও স্বপ্ন দেখে বিশ্বজয়ের কিন্তু মাঝে মাঝে মন তার বিদ্রোহ হয়ে ওঠে। নাগাসাকি হিরোসিমার কঠিন নৃশংস রূপ ভেসে উঠতো তার চোখের সামনে। বিবেক বাধা দিতে কিন্তু সে যে গোথুলায় বন্দী।

দীর্ঘ সময় পর যখন মিস হ্যানরী শ্রীমা স্বাধীনতা পেলো তখন আর তার মনে নেই মুক্তির আকুলতা, নেই দেশে ফেরার প্রবল বাসনা। দেশে তার এমন কোনো বন্ধন ছিলো না যা তাকে আকর্ষণ করে। বৃদ্ধা মা ছিলো, বাবা মরে গিয়েছিলো গ্রীমাকে শিশু রেখে।

মা-ও একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

মিস গ্রীমা এর পর থেকে স্বাধীন-মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুরে বেড়াতে পৃথিবীর সর্বত্র। যেখানেই যে দেশই হোক খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে ছুটে যেতো সে। অশ্ব চালনাতেও মিস গ্রীমা দক্ষ ছিলো। সে একবার হাংহায় ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে কোটি টাকার অধিকারিণী হয়েছিলো।

এর পর থেকে অনেকেই মিস গ্রীমার পিছু লেগেছিলো, ওকে বাগাতে পারলেই কোটি টাকা আত্মসাৎ করা যাবে। কিন্তু মিস গ্রীমা অত্যন্ত সুচতুরা তাই তাকে কেউ হাত করতে পারেনি। মিঃ বর্মণ তাকে তুলে এনেছিলো তারই অজ্ঞাতে সুকৌশলে এবং সুকৌশলেই নিজের বেড়াজালে রেখে তার দ্বারা কার্যোদ্ধার করে চলেছে।

মিস গ্রীমাকে চিন্তিত দেখে বললো মিঃ বর্মণ-মিস গ্রীমা, কি ভাবছো? নতুন কোনো চিন্তা করছে বুঝি?

গ্রীমার হুঁশ যেন ফিরে এলো, বললো–হাঁ ভাবছি যা নির্দেশ পেলাম তাই নিয়ে। লোকটা যে পাথরগুলো ঈগলের গহ্বরে থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে ঐ পাথরগুলো আমার দরকার।

একটু হেসে বললো মিঃ বর্মণ-ওগুলো উদ্ধার করতে তেমন কোনো কষ্ট হবে না যদি লোকটাকে পাওয়া যায়।

মিঃ জং জিং লোমা বললো–ঐ পাথরগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে। বহুমূল্য পাথর, ওগুলো। আর প্রথমে আমিই ঐ পাথরগুলোর সন্ধান পাই এবং তোমাকে জানাই মিঃ বর্মণ।

হাঁ, এ কথা অবশ্য ঠিক। বললো মিঃ বর্মণ।

মিঃ বর্মণের মনের আকাশে তখন ভাসছে ঈগলের ধ্বংসকূপের মধ্যে মূল্যবান পাথরগুলো যা সূর্যের রশ্মির মত আলো ছড়াচ্ছিলো। সাগরের গভীর জলধারার তলদেশ দীপ্ত ময় হয়ে উঠেছিলো সেই পাথরগুলোর উজ্জ্বল আলোতে। মিঃ বর্মণ ও তার সঙ্গীরা সবাই দেখেছিলো গডসের সেই হারানো সম্পদগুলো। যা তাদের চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দিয়েছিলো সেদিন।

হঠাৎ তাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায় উল্কার অভ্যন্তরের সবকিছু।

মিঃ বর্মণ ও সঙ্গীদের মুখে খুশির উচ্ছ্বাস দেখা যায়। এবার তারা যেন ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে।

*

রহমান আর বনহুর তাদের দরবার কক্ষে কথাবার্তা বলছিলো। কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে গোপন আলোচনা চলছিলো তাদের মধ্যে। হঠাৎ বিপদ সংকেত আলো জ্বলে উঠলো।

চমকে উঠলো রহমান-সর্দার উল্কার বিপদ সংকেত আলো জ্বলে উঠেছে। নিশ্চয়ই তার অভ্যন্তরে কোনো বিপদ ঘটেছে। এটা তারই সংকেত।

হাঁ, রহমান! বনহুর উল্কার অভ্যন্তরের দৃশ্য দেখার জন্য টেলিভিশন ক্যামেরার সুইচ টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে যে দৃশ্য টেলিভিশন পর্দায় ফুটে উঠলে তা অত্যন্ত ভয়ংকর। উল্কার অভ্যন্তরের জিনিসপত্র সব ছড়ানো। নাবিকগণ এখানে ওখানে উবু হয়ে পড়ে আছে। কারও দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন কারও বুক থেকে রক্ষা গড়িয়ে পড়ে উল্কার মেঝে সিক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু মহাথরো কোথায়? তাকে তো দেখা যাচ্ছে না।

বনহুর আর রহমান চিন্তিত হলো।

বনহুর বললো–তাজকে প্রস্তুত করো, আমি এক্ষুণি উল্কায় যাবো।

তাজ প্রস্তুত আছে সর্দার। আমিও যাবো।

হাঁ, তুমিও চলো রহমান। আমার মনে হয় হঠাৎ উল্কার বুকে কোনো হামলা হয়েছিলো।

সর্দার, মহাথরো তো এ-কাজ করে ভাগেনি?

এমন চিন্তা তোমার করা উচিত নয় রহমান। এই ক' বছরে মহাথরোকে চিনতে আমার বাকি নেই।

কথাগুলো বলতে বলতে বেরিয়ে আসে বনহুর আর রহমান। অশ্বশালায় এসে তাজের পাশে দাঁড়ায় বনহু, আর রহমান তার দুলকির পাশে।

তাজ শব্দ করে এবং সম্মুখ পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে। পশু হলেও তার এটুকু জ্ঞান ছিলো যে, সর্দার এসেছে তার পাশে। আনন্দধ্বনি করে তাজ। এটা তার অভ্যাস প্রথম থেকেই, বনহুরকে পেলে তার চোখে ফুটে ওঠে একটা আনন্দদীপ্ত ভাব। সে শব্দ করে চিহি চিহি আর সম্মুখ পা দু'খানা দিয়ে মাটিতে মৃদু মৃদু আঘাত করে।

তাজের পিঠ চাপড়ে আদর করতে বনহুর।

নূরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে আর উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়তো। বলতে নূরী-তাজ তোমার সাথী, তোমার বন্ধু……

বনহুর বলতো-ঠিক বলেছো নূরী, তাজ আমার প্রিয়, আমার জানের জান, আমার পিয়ারের বন্ধু…….

এমনি কত কথা কত আলাপ হয়েছে তাজকে নিয়ে নূরীর সঙ্গে।

তাজ আর দুলকির পিঠে দুজন চেপে বসলোবনহুর আর রহমান। কান্দাই জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হলো অশ্বখুরের শব্দ। বনহুরের অশ্ব যখন কান্দাই জঙ্গল অতিক্রম করতো তখন জঙ্গলো জীবজন্তুগুলো ছুটে পালাতত গভীর জঙ্গলে। এমন কি হিংস্র জীবজন্তুগুলোও ভীত আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যেতো।

তাজের খুরের শব্দ ছিলো অত্যন্ত তীব্র আর কঠিন।'

মানুষের মনেও যেমন আতঙ্ক জাগতো তেমনি জঙ্গলের প্রাণীদের হৃদয়ে জাগতো। ভয়ভীতি। এমন কি গাছের ডালে বসে থাকা ঈগল পাখীগুলোও উড়ে পালাতে।

*

বনহুর আর রহমানের অশ্ব যখন উল্কার কাছাকাছি পৌঁছলো তখন তারা দেখতে পেলো একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে উল্কার বুকে। বনহুর আর রহমান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে উল্কায় উঠে গেলো।

উল্কার অবস্থা দেখে ভীষণ চিন্তিত হলো বনহুর।

রহমান তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। যারা উল্কায় অবস্থান করছিলো তাদের কেউ। জীবিত নেই। সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহগুলোর মধ্যে মহাথরোর কোনো হদিস পাওয়া গেলো না। কোথায় মহাথরো, তবে কি এ কাজ মহাথরোর?

বনহুর আর রহমান ভীষণ চিন্তিত হলো?

মহাথরো বিশ্বাসীই শুধু নয়, তার একনিষ্ঠতা বনহুরকে অভিভূত করেছিলো। মহাথরো এমন কাজ করতে পারে না......

বনহুর আর রহমান বিস্ময়াহত অবস্থায় দেখছে, নানাভাবে হত্যা করা হয়েছে উল্কার নাবিকদের। এমন কি ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরকেও ওরা রেহাই দেয়নি, তাকেও নিহত অবস্থায় তার ক্যাবিনে পাওয়া গেলো। হঠাৎ বনহুরের নজর গেলো ক্যাপ্টেনের বক্ষে বসানো ছোরার বাটের ওপর।

ছোরাখানা টেনে তুলে নিলো হাতে।

তীক্ষ্ণধার ছোরাখানার বাটে দুটি অক্ষর। অক্ষর দুটি জার্মান ভাষায় লেখা। বনহুর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বটের অক্ষর দুটি পরীক্ষা করলো, কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল।

*

ভূগর্ভ ঘটির একটা অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে মহাথরোকে। তার হাত-পা শৃখলাবদ্ধ। সমস্ত দেহে আঘাতের চিহ্ন। জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন। চোখের কোলে কালিমা। পাশেই অস্ত্র তৈরির কারখানা, সর্বদা একটা ভয়ংকর উৎকট শব্দ। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি হচ্ছে কারখানায়। বিরাট বিরাট লৌহবলয় কেটে

টুকরো টুকরো করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধাতু মেশানো হচ্ছে এই সব বিস্ময়কর মেশিনে। অপর একটি কারখানায় তৈরি হচ্ছে পারমাণবিক বোমা তৈরির খোলস, ঐ সব খোলসের মধ্যে বারুদ এবং বিষাক্ত গ্যাস ভর্তি করা হয়; তার সঙ্গে খোলসে ভরানো হয় বিরাট বিরাট লৌহ কেটে তারই খন্ড খন্ড টুকরা। পারমাণবিক বোমার এক একটির ওজন অনেক, এক একটি বোমা বহন করতে এক একটি জেট বিমান প্রয়োজন হয়। একটি বোমা দ্বারা একটি দেশ ধ্বংস করা যায়। শুধু ধ্বংসই নয় পারমাণবিক বোমার মধ্যে যে বিষাক্ত গ্যাস ভরানো হয় তা অত্যন্ত মারাত্নক। গ্যাসের প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আহত এবং সুস্থ সবারই মৃত্যু ঘটবে তাতে কোনো ভুল নেই। হঠাৎ যদি কেউ কোনোক্রমে বেঁচে যায় তারা হবে অন্ধ আর পঙ্গু। দেহে তাদের কোনো শক্তি বা বল থাকবে না, এমনকি চলৎশক্তি রহিত হবে।

মিঃ বর্মণ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য শত শত বৈজ্ঞানিক এবং কারিগর, শ্রমিক মজুর বিভিন্ন দেশ থেকে গোপনে সুকৌশলে তুলে এনেছে। তাদের ওপর কঠোর নজর রাখা হয়, কোনোক্রমে যেন এরা গোধুলা দ্বীপের বাইরে যেতে না পারে। এরা ভূগর্ভ থেকে উপরে উঠে আসতেও পারে না, কঠিনভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে। যারা নতুন তাদের পায়ে বেড়ী পরানো আছে। অস্ত্রাগারে কাজ করে, সময়মত খেতে দেওয়া হয় কিন্তু তাদের কোনো পারিশ্রমিক ছিলো না। চিরদিনের জন্য তাদের এভাবে কাজ করেই যেতে হবে।

যাদের বয়স বেড়ে যেতো, কাজে অক্ষমতা আসতো তাদেরে গুলী করে হত্যা করা হতো সবার অলক্ষ্যে গভীর অন্ধকার যুক্ত কোনো এক কক্ষে। এমনি করে মিঃ বর্মণ তার কাজ বা সাধনা সফল করে চলেছিলো।

মহাথরো তাদের আর একটি শিকার। মিঃ বর্মণ উল্কার অভ্যন্তর থেকে ওকে যখন বন্দী করে আনলো তখন উল্কার সবাইকে তারা হত্যা করলো নির্মমভাবে। তাদের উদ্দেশ্য মহোথরকে বন্দী করে আনা। তাদের ধারণা এই ব্যক্তিই সেই ব্যক্তি যাকে তারা কান্দাই সাগরের গভীর জলতলে নিমজ্জিত জাহাজের খোলর মধ্যে ডুবুরী হিসেবে কাজ করেছে। সেই তুলে এনেছে মিঃ গডসের মূল্যবান পাথরগুলো।

মিঃ বর্মণ মহাথরোকে বন্দী করার সময় সেই পাথরগুলো সঙ্গে নেবার জন্য নির্যাতন চালিয়েছিলো, সেই মুহূর্তে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলো উল্কার অনুচরদের

কাছে। মিঃ বর্মণ তার এক শক্তিশালী মারাত্নক বেড়ী ধরনের অস্ত্র দ্বারা এক একজনকে হত্যা করেছে।

তবুও মহাথরো বলেনি সে ঐ ব্যক্তি নয় যাকে তারা সাগরতলে ডুবুরী বেশে দেখেছে। নিশ্চুপ হয়ে বর্মণের অত্যাচার সহ্য করেছে মহাথরো এবং তাকে যখন বন্দী করে বর্মণ তার স্পীড বোটে তুলে নিয়ে গেলো তখন তার জীবন বিপন্ন জেনেও সর্দার সম্বন্ধে কোনো কথা বলেনি। মিঃ বর্মণ মহাথরোকে তার ঘাঁটিতে এনেও নানাভাবে নির্যাতিত করে চলেছে তবুও একটি কথাও সে ব্যক্ত করেনি, বলেনি সে ঐ ব্যক্তি নয়, ঈগলের গহ্বর থেকে যে মূল্যবান পাথর উদ্ধার করেছে। সে জানতো, সত্য কথা ব্যক্ত করলে এই শয়তানদল তাকে খুঁজে বের করবে এবং আবার নতুন একটা বিপদের সম্মুখীন হবে সর্দার। কাজেই আসল কথা চেপে যাওয়াই শ্রেয়। যতই নির্যাতন চলুক মহাথরো তা হজম করবে অনায়াসে।

বন্দী মহাথরো জানে আর কোনোদিন সে মুক্তি পাবে না। এরা ভয়ংকর মানুষ। এদের মনে নেই দয়ামায়া বা কোনো রকম মনুষত্ববোধ। নিজের সম্বন্ধে সব চিন্তা ভাবনা একেবারে ত্যাগ করে মহাথরো।

সময় অসময়ে নেই, সর্বক্ষণ প্রায় নির্যাতন চালানো হয় মহাথরের উপর। তাকে বার বার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, আসল কথা না বলা পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না।

সেদিন মহাথরোর উপরে চলছে অত্যাচার, শিক গরম করে তার শরীরে লাগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে-বলো তুমি সেই ব্যক্তি কিনা! সত্যি কথা বলো? যতক্ষণ আসল কথা না বলবে ততক্ষণ তোমার শরীরের অংশ আগুনে দগ্ধ হবে এবং তোমার মুখ দিয়ে আসল কথা বের করে নেবো আমরা। তবুও তোমাকে জানে মারবো না, কারণ তুমিই ঐ ব্যক্তি যাকে আমরা খুঁজে ফিরছি। বলল সেই মূল্যবান পাথর কোথায় আছে?

মহাথরো যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ফেলছে, তবুও তার মুখে কোনো নেই কথা। বহুক্ষণ ঋরে নির্যাতন চলার পর মহাথরোকে তার বন্দীশালায় পুনরায় বন্দী করে রাখা হলো।

মহাথরোর বয়স হয়েছে, এই নির্মম যন্ত্রণা সহ্য করার মত তার ক্ষমতা দিন দিন রোহিত হয়ে আসছে। ক্রমান্বয়ে শিলি হয়ে আসছে তার দেহমন।

জীবনে মহাথরো অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করেছে, ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে স্নেহ-মায়া মমতা থেকে বঞ্চিত সে। কিছু বড় হতেই কাজে নেমেছিলো মহাথরো। পেটের দায়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করে জীবন বাঁচাতে হয়েছে। সুখ তার জীবনে আসেনি কোনোদিন। প্রৌঢ় বয়সে বনহুরের কাছে পেলে সে শ্রদ্ধা-ভালবাসা। বনহুর তাকে গুরুজনের মত সম্মান দিতে, একজন দক্ষ বৈজ্ঞানিক হিসাবে যতটুকু পাওয়া তার প্রাপ্য তাই সে পেয়েছিলো। বেশ শান্তি আর সুখেই ছিলো মহাথরো, হঠাৎ তার জীবনে আবার নেমে এলো চরম এক অভিশাপ।

সমস্ত দিন নির্যাতন সহ্য করার পর গভীর রাতে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করতো মহাথরো কিন্তু সেই ভয়ংকর উৎকট শব্দে তার দুখানা কান তালা লেগে যেতো। ঘুমানো দূরের কথা অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতো তার সমস্ত শরীর। কানে কাগজ গুঁজে দিতো, কখনও বা দাঁত দিয়ে জামার অংশ ছিঁড়ে কানে ভরতো। আজকাল তার হাত-পার শিকল মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, তাই হাত দুখানা দিয়ে কান চেপে ধরে থাকতো সে। পাশের দেয়ালে ছিলো একটা ফুটো, কোনোদিন হয়তো কোনো পাইপ প্রবেশপথ তৈরি করা হয়েছিলো এ ফুটো দিয়ে।

মহাথরো একদিন ঐ ফুটোর ওপাশে দেখার চেষ্টা করলো। বিকট শব্দ কিসের জানার জন্যই দেখতে গেলো সে। ফুটো দিয়ে ওপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই আরষ্ট হয়ে গেলো মহাথরো। বিরাট ধরনের একটি মেশিন, কতকগুলো লোক এক একটি লৌহখন্ড তুলে দিচ্ছে সেই ভয়ংকর মেশিনটার গহ্বরে। বিপরীত দিক দিয়ে লৌহখন্ডগুলো টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসছে। কতকগুলো লোক সেই টুকরো টুকরো লৌহগুলো তুলে নিচ্ছে এবং সেইস্থান থেকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্যস্থানে। যারা লৌহখন্ডগুলো তুলতে পারছে না তাদের দেহে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। কোকিয়ে কেঁদে উঠছে শ্রমিকগুলো, গুমড়ে কাঁদছে, আবার বিরাট বিরাট লৌহখগুগুলো অতিকষ্টে তুলে মেশিনের মধ্যে ভরে দিচ্ছে।

মেশিনের মধ্যে লৌহখন্ডগুলো কেটে টুকরো টুকরো হচ্ছে তারই শব্দ মহথরোর স্বস্তি আর রাত্রির নিদ্রা কেড়ে নিচ্ছে। কি নির্মম শাস্তি ভোগ করছে শ্রমিকগুলো।

মহাথরো বুঝতে পারে সবকিছু। এটা কোনো অস্ত্র তৈরির কারখানা এবং যে শ্রমিকগণ এখানে কাজ করছে তারা বন্দী এবং এক একজন তারই মত নির্যাতিত হচ্ছে। উঃ! কি ভয়ংকর কার্যকলাপ। মহাথরোর দেহের রক্ত যেন জমে গেলো। এরা কারা, যারা তাকেও বন্দী করে এনেছে। তবে এরা যে কোনো শয়তান লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহাথরো দুদিন পর অনুধাবন করলো সবকিছু। তাকেও কাজে নামানো হলো। নির্যাতন কিছুটা লাঘব হলো বটে কিন্তু তাকে যে কাজ দেওয়া হলো তা অত্যন্ত কঠিন। গ্যাস এবং বারুদ মিশিয়ে ব্রোঞ্জের কভারে ভরানো। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন এ কাজে নিয়োজিত ছিলো।

এবার মহাথরোর কাছে সব জানা হয়ে গেলো।

যেখানে তাকে আনা হয়েছে সে স্থান সাধারণ নয়, কোনো একটা ভূগর্ভ কারখানা এবং এই স্থানে কোন অস্ত্র বা বিষাক্ত বোমাই তৈরি হচ্ছে। দক্ষ বৈজ্ঞানিক মহাথরোর বুঝতে বাকি থাকে না। আরও বুঝে নেয় মহাথরো, যে গ্যাস আর বারুদ মিশিয়ে বোমা তৈরি হচ্ছে তা অত্যন্ত মারাত্মক এবং তার শক্তি অতি সাংঘাতিক।

এখানে কারা কাজ করছে তারা সবাই বড় অসহায় এবং বন্দীর মত কাল যাপন করছে। তাদের ওপর চালানো হচ্ছে কঠিন নিষ্পেষণ। একটি বৃদ্ধ শ্রমিক কাজ পারতো না তার শরীরে এসেছে শিথিলতা। চোখের রং হয়েছে ঘোলাটে। কপালের রগগুলো ফুলে আছে দড়ির মতন। লোকটা যখন মহাথরোকে কাজে সাহায্য করছিলো তখন তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পেরে মহাথরো অপর একজনকে তার সঙ্গে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানায়। বৃদ্ধকে অবসর দেয় মহাথরো। বৃদ্ধ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, কারখানার বাইরে একটা নির্জন স্থানে বসে সে বিশ্রাম করছিলো। ঘটনাক্রমে সেই সময় মিঃ বর্মণ তার সহচরদের নিয়ে কারখানা পরিদর্শনে বেরিয়েছিলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো বৃদ্ধ শ্রমিকটির ওপর। বললো সে কাজ রেখে বসে আছো কেন?

বৃদ্ধ শ্রমিকটি জবাব দিলো-বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাই......

তাই বিশ্রাম নিচ্ছিলো, তাই না?

হা স্যার......

কথাটা শেষ হয় না বৃদ্ধ শ্রমিকটির, মিঃ বর্মণের দক্ষিণ হাতে ছিলো রিভলভার, মুহূর্তে গুলী ছুঁড়লো সে বৃদ্ধের বুক লক্ষ্য করে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় বৃদ্ধ শ্রমিকটি মেঝেতে।

মহাথরো ওপাশে কাজ করছিলো সে আর্তনাদ এবং গুলীর শব্দ শুনতে পেয়ে মাথা উঁচু করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সঙ্গে সঙ্গে তার মুখমন্ডলে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দেয়। বুকের মধ্যে জ্বালা করে ওঠে তার কারণ বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ সে নিজে। বৃদ্ধ যা পারছিলো তবু করছিলো, সে অলসতা করেনি বা কাজে ফাঁকি দেয়নি। মহাথরোর মনে মায়ার সঞ্চায় হয় এবং সেই বৃদ্ধ শ্রমিককে সে বিশ্রাম করতে বলে। তার পরিণতি যে এমন দাঁড়াবে ভাবতে পারেনি মহাথরো।

মহাখবর বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে, কত বড় হৃদয়হীন জানোয়ার হলে সে কাউকে এভাবে হত্যা করতে পারে। মহাথরোর কানে ভেসে এলো মিঃ বর্মণের কণ্ঠস্বর, বললো সে তার সঙ্গী দু'জনকে লক্ষ্য করে-আবর্জনা হটিয়ে দিলাম। কাজ যে না পারবে তার স্থান আমার ভূগর্ভ কারখানায় নেই। ওকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করার জন্য বলে দাও।

কথাগুলো বলে মিঃ বর্মণ তার সঙ্গীদের সহ অন্য দিকে পরিদর্শনে চলে গেলো।

মহাথরো ছুটে এলো এবং বৃদ্ধের মাথাটা তুলে নিলো কোলে।

ততক্ষণে বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

মহাথরের বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

ধীরে ধীরে মাথাটা ওর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায় মহাথরো। আবার সে কাজে যোগ দেয়। তার শরীরের নানা স্থানে অগ্নিদগ্ধ শিকের ফোস্কা এখনও শুকিয়ে যায়নি। তার ভীষণ কষ্ট হয় বিষাক্ত গ্যাস আর বারুদের গন্ধ তার শরীরের ক্ষতস্থানগুলোকে আরও পচন ধরিয়ে দেয়।

তবুও তাকে কাজ করতে হয়।

মিঃ বর্মণ যদি জানতো মহাথরো একজন সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক তাহলে তার দ্বারা আরও কঠিন কাজ সমাধা করে নিতে। সে কাজ হয়তো আরও কষ্টসাধ্য যা করতে গিয়ে প্রাণ হারাতত সে। কারণ মহাথরোর মস্তিষ্ক আজকাল ভাল ছিলো না। কঠিন নির্যাতনের শিকার মহাথরো, তাই প্রায়ই কাজ করতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তো সে।

গ্যাস আর বারুদ মেশাতে গিয়ে একদিন ভুল করে বসেছিলো আর কি! একটু ভুল হলেই ব্রোঞ্জের বিরাট আকার বোমা বাষ্ট হতো, তার সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যেতে মিঃ বর্মণের অস্ত্রাগার আর মহাথরোর দেহের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেতো না।

মহাথরো মরতে চায় না, কারণ-সর্দার তার ওপর অনেক ভরসা রাখে। সর্দার বনহুর যতদিন বাঁচবে ততদিন বাঁচতে চায় মহাথরো। সর্দারকে ওর খুব ভাল লাগে-শুধু ব্যবহার নয়, তার সৌম্যসুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা তাকে অভিভূত করে, বহু লোক মহাথরোকে দেখেছে। কিন্তু এমন লোক সে দেখেনি, যাকে শুধু সম্মানই করা যায় না, তাকে দেখলে ভয় আর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়।

রাতে যখন কাজ থাকে না তখন শুয়ে শুয়ে মহাথরো ভাবে বনহুরকে।

আজ বেশ কিছুদিন হলো তাকে এখানে বন্দী করে এনেছে এরা। তারপর থেকেই কঠিন বন্দীজীবন। অনেকেই তার সঙ্গী কিন্তু কারও সঙ্গে সে একান্তভাবে মিশতে পারেনি, সবাই যেন কেমন প্রাণহীন, যান্ত্রিক মানুষ বলে তার মনে হয়। কলের পুতুলের মত সবাই কাজ করে যায়, কারও মন আছে বলে বোঝা যায় না। সবাই কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে সারাটা দিনরাত। বিশ্রাম তারা জানে না, কথা বলতেও যেন ওরা ভুলে গেছে। শেষ রাতে কিছু শুকনো রুটি আর মাংস দেওয়া হয়। তাও গরু বা ছাগলের মাংস নয়-সব শুকরের মাংস, অর্ধসেদ্ধ। ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা, ওরা তাই গোগ্রাসে খায়।

মহাথরোও বাধ্য হয় এসব খেতে, বাঁচতে হলে খেতেই হবে যে!

দুদিন হলো একটা লোককে এরা বন্দী করে এনেছে। লোকটা আধপাগল মনে হয় তবে যে কাজে লাগানো যায় সে কাজে অসাধ্য হলেও করতে পারে। লোকটার মুখে রাশিকৃত দাড়ি, মাথার চুলে জটা ধরেছে, মুখের প্রায় অংশই চুল আর দাড়িতে ঢাকা। চোখে কালো চশমা পরে থাকে সে সর্বক্ষণ।

মহাথরো শুনেছে লোকটাকে জেলেনৌকা থেকে তুলে আনা হয়েছে।

এর বেশি জানার সৌভাগ্য তার হয়নি।

ভেবে পায়নি মহাথরো একটা বদ্ধ পাগল কি কাজ করবে। হয়তো দু'একদিন পর ওকেও গুলী করে হত্যা করা হবে ভুল নেই। পাগলটির জন্য ভাবতে

মহাথরো।

বেশ কয়েক দিন কেটে গেলো।

সবার চেয়ে ভাল কাজ করতে পাগলটা।

যদিও সে কথা বলতো না কিন্তু কাজে সে নির্ভুলভাবে করত।

তাই ওকে মিঃ বর্মণ ভাল চোখে দেখতে।

পাগল হলে কি হবে, দৈহিক শক্তি আর স্মরণশক্তি তার প্রখর ছিলো। একদিন পাগলকে দেওয়া হলো পারমাণবিক বোমা তৈরির মূল কারখানায়। এখানে সহজে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি শেষে এখানে এনে রাখা হয়।

এখানে গুছিয়ে রাখা হয়েছে বিশ্ব ধ্বংসী পারমাণবিক বোমা।

খোলস লাগানোর পর সুইচ বসানো হয়। ব্রোঞ্জের বৃহদাকার বোমাগুলো। খোলস লাগানোর পর সুইচ কোনোক্রমে বাই হলে আর রক্ষা নেই সমস্ত গোধুলা বালুকণার মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, অস্ত্রাগার বা কোনো যন্ত্রাদির চিহ্নও থাকবে না সেখানে। প্রাণীজগৎ বলে কোনো অস্তিত্বই থাকবে না গোথুলায়।

মহাথরোকে কঠিন নির্যাতন চালানোর পরও সে কোনোরূপ বিরোধিতা করেনি, যে কাজ তাকে দেওয়া হয়েছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে করছে। তেমনি পাগল জেলেটিও কিছুদিনের মধ্যে অন্যদের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠলো। মিঃ বর্মণ ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যে ক'জন বাছাই বৈজ্ঞানিক এবং পারমাণবিক বোমা তৈরির কারিগর ও গবেষক পারমাণবিক অস্ত্রাগারের ভেতরে কাজ করতে তাদের সহায়তার জন্য দেওয়া হলো মহাথরো আর পাগল জেলে শ্রমিককে।

মিঃ ক্যাথেগো, মিঃ জং জিং লোমা এবং মিস হ্যানরী গ্রীমা এরা রাজি হয়নি কারখানার মেশিনরুমে ওদের পাঠাতে। মিঃ বর্মণ বলেছিলো, আমার কর্মচারীদের মধ্যে এরাই কাজে পারদর্শী দেখছি। তবে হাঁ, মেইন অস্ত্রাগারের কাজ সমাধা হলে……এরা কেউ ফিরে যেতে পারবে না, সবাইকে আমি অন্ধকার গুমঘরে পাঠাবো। মিঃ ক্যাথেগো, আপনারা যা ভাবছেন তা আমি হতে দেবো না। আমি বর্মণ-আমাকে বা আমার প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করবে কিংবা আমার অস্ত্রাগারে

সন্ধান বাইরের জগতে উদ্ঘাটন করে দেবে কোনোদিন তা কেউ পারবে না। অট্টহাসি হেসেছিলো সেদিন বর্মণ সিং।

*

গভীর রাত।

কাজ চলছে কারাখানায়।

কঠিন লৌহখন্ড টুকরো টুকরো করে কেটে পড়ার শব্দ, সমস্ত ভূগর্ভ কারখানার অভ্যন্তর যেন ফেটে পড়ছে। সেকি সাংঘাতিক মেশিন এক একটি-যেন লৌহদানব! মেইন কারখানার ব্রোঞ্জ খোলে বিষাক্ত গ্যাস মেশানো বারুদ আর লৌহখন্ড ভরানো হচ্ছে।

অনেক রাত তবুও কাজ চলছে।

ভূগর্ভে রাত বা দিন বোঝার কোনো উপায় নেই, আর সে জন্যই শ্রমিকগণ দিনরাত খেটে চলেছে। আহার-ভ্রি-বিশ্রাম কোনোটার যেন প্রয়োজন নেই তাদের।

মাঝে মাঝে মিস গ্রীমা আসে। সবাই কাজ করছিলো, হঠাৎ একজনের হাতের কিছু অংশ কেটে যায়। রক্ত গড়িয়ে পড়ে হাত বেয়ে।

মিস গ্রীমার দৃষ্টি পড়ে শ্রমিকটার ওপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে নিজের রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দেয় এবং তাকে বিশ্রামের নির্দেশ দেয়।

লোকটার চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে ওঠে।

এই দৃশ্য বর্মণের নজরে পড়ে যায়।

বাঘের মত গর্জে ওঠে মিঃ বর্মণ-মিস গ্রীমা, তোমার এত সাহস হলো কি করে? শ্রমিকদের প্রতি তোমার দুর্বলতা আমি প্রায়ই লক্ষ করেছি। আমি যদি তোমাকে গুলী করে হত্যা করি ওদের কারও সাধ্য নেই তোমাকে রক্ষা করে আমি লক্ষ করেছি আরও অনেক দিন তুমি শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে অনেক দয়া দেখিয়েছে। এটা আমার পছন্দ নয় সেটাও তোমাকে বলে দিয়েছি তবুও তুমি……

মিঃ বর্মণ, আমি তোমার হুকুমের দাস নই। আমাকে তুমি জোর করে তোমার বশ্যতা স্বীকার করাতে পারবে না। তুমি যে কাজ করছে তা শুধু অপরাধজনক নয়, বিশ্ববাসীর কাছে তুমি নরশয়তান এবং যমদূত। আমি তোমার এ গোপন কার্যকলাপের কথা সব ফাঁস করে দেবো!

মিঃ বর্মণ চোখ দুটো আগুনের গোলার মত করে তাকালো মিস গ্রীমার দিকে। তারপর মুহূর্ত বিলম্ব না করে কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার খুলে নিলো হাতে। গ্রীমার বুক লক্ষ্য করে রিভলভার উদ্যত করে বললো–আমার এই প্রচেষ্টা আর আমার কারখানার কথা তোমাকে আর ফাস করার সুযোগ দেবো না……

রিভলভারের সুইচ টিপবার পূর্বমুহূর্তে পাগল শ্রমিক মিঃ বর্মণকে পেছন থেকে বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে চেপে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের গুলী দেয়ালে গিয়ে বিদ্ধ হলো।

মিস গ্রীমার দু'চোখে বিস্ময়। এতক্ষণ তার প্রাণহীন দেহটা মুখ থুবড়ে পড়তো, রক্তে রাঙা হয়ে উঠতো কারখানার মেঝের কিছু অংশ। পাগল শ্রমিক যাকে গ্রীমা অবহেলা আর অবজ্ঞার চোখে দেখেছে, মাঝে মাঝে পাগলের কার্যকলাপ ও তার দৈহিক শক্তি দেখে অবাক হয়েছে, সে-ই তাকে আজ বাঁচিয়ে নিলো সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে।

পাগলটার বলিষ্ঠ মুষ্টি থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে না মিঃ বর্মণ। হাত থেকে রিভলভারখানা খসে পড়লো। অন্য সকলে স্তম্ভিত হতবাক! এমন ঘটনা ঘটবে তারা ভাবতেও পারেনি। মিঃ বর্মণ আজ দীর্ঘ সময় তার এই অস্ত্র কারখানার জন্য বহু নতুন নতুন শক্তিশালী শ্রমিক তুলে এনেছে এবং তাদের দ্বারা ঠিকমত কাজকর্ম সমাধা করিয়ে নিচ্ছে। যে অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে তাদের ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই। তারা মিঃ বর্মণের রিভলভারের গুলীতে জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। এখান থেকে একটি প্রাণীও কোনোদিন জীবন নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেনি। মিঃ বর্মণ আশা করে কেউ কোনোদিন যেতে পারবেও না। আজ পাগলের কাছে মিঃ বর্মণের পরাজয়-একেবারে আশ্চর্য ব্যাপার। যে বর্মণ বিনাদ্বিধায় শত শত মানুষকে হত্যা করেছে, আজ সেই বর্মণ এমনভাবে পরাজিত হলো একটি পাগল শ্রমিকের কাছে-বিস্ময়কর বটে।

পাগল শ্রমিক দক্ষিণ পা দিয়ে মিঃ বর্মণের হস্তচ্যুত রিভলভারখানা দূরে নিক্ষেপ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে মহাথরো দু'হাত পেতে ধরে ফেললো রিভলভারটি। সে তাকিয়ে দেখছে ব্যাপারখানা, সেও কম অবাক হয়নি। পাগল শ্রমিকটি এখানে আসার পর নীরবে শুধু কাজই করে গেছে, কোনো কাজে সে অবহেলা বা অলসতা করেনি, কথাবার্তা সে বলতো না। শুধু কাজই ছিলো তার নেশা। অনেক সময় মহাথরো তাকে অনেক প্রশ্ন করে বিমুখ হয়েছে, কোনো জবাব সে দেয়নি। আজ সেই পাগল শ্রমিক হঠাৎ এভাবে ক্ষেপলো কেন!

পরক্ষণেই মহাথরোর দু'চোখ বিস্ময়ে আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠলো, তাকিয়ে দেখলো পাগল, শ্রমিক দক্ষিণ হাতে রিভলভার উদ্যত করে মিঃ বর্মণের বুকে চেপে ধরে আছে। বাঁহাতে নিজের মাথার জটাজুট এবং মুখের দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলেছে। মহাথরা নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। অস্ফুট ধ্বনি করে ছুটে আসে-সর্দার.......

মিঃ বর্মণ এবং তার সঙ্গীদের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। কে এই ব্যক্তি যে পাগল শ্রমিকের বেশে এতদিন নির্বিকার চিত্তে গোপন অস্ত্রাগারের বিভিন্ন কঠিন কাজে অংশ গ্রহণ করে এসেছে। এমন কি মিস হ্যানরী গ্রীমাও হতবাক বিস্মিত স্তম্ভিত। ভাষা হারিয়ে গেছে সবার।

বনহুর পাগল শ্রমিক বেশে মিঃ বর্মণের পারমাণবিক অস্ত্রাগারে কৌশলে এসে সকল তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছে। বনহুর বললো–মহাথরো, শয়তান বর্মণ তোমাকে উল্কা থেকে তুলে না আনলে আমি হয়তো এতো শিগগির এদের সন্ধানে লিপ্ত হতাম না। তুমি মুহূর্ত বিলম্ব করো না, ওপাশে কয়েকটি লৌহশিকল পড়ে আছে, তা দিয়ে এদের বেঁধে ফেলে। এই থামগুলোর সঙ্গে ভালভাবে মজবুত করে বাঁধবে যেন নড়াচড়া করতে না পারে। আমি একটি বোমার সুইচ চালু করে রেখে এসেছি। মাত্র এক ঘন্টা সময় আছে, ঐ অসীম শক্তিশালী পারমাণবিক বোমাটি বাষ্ট হতে। সমস্ত গোধুলা দ্বীপ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। মিঃ বর্মণ তার আজীবন কঠিন সাধনা দিয়ে যে বোমা তৈরি করেছে, তার নিজের সৃষ্টি দিয়ে নিজেই ধ্বংস হবে চিরতরে। হাঃ হাঃ হাঃ কত সুন্দর সৃষ্টি তোমার মিঃ বর্মণ।

বর্মণ ভীত আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে, বুকে শক্ত রিভলভারের জমকালো মুখ ঠেকে। আছে কঠিনভাবে। একচুল নড়লে গুলী বেরিয়ে আসবে ঐ জমকালো নলের মুখ থেকে। তখনই ঢলে পড়বে তার দেহটা......উঃ! কি ভয়ংকর মৃত্যু! মিঃ বর্মণের বুকে রিভলভার চেপে ধরে রাখায় তার সঙ্গীসাথীরা কেউ একচুল নড়তে

সাহসী হচ্ছে না। মিঃ ক্যাথেগো, মিঃ লোমা, মিস হ্যানরী গ্রীমা সবাই থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ তাদের মহাপরিচালক যমদূতের মুখে।

মিস গ্রীমার মনে আনন্দ-উচ্ছ্বাস। কে এই দেবসম পুরুষ, যে মিঃ বর্মণের এই জঘন্য কাজে বাধা দান করতে এসেছে। গ্রীমা কোনোদিনই এ কাজের পক্ষপাতী ছিলো না। কোনোদিন সে উৎসাহ পায়নি মিঃ বর্মণের কার্যকলাপে, তবুও তাকে সব কাজে সহায়তা করতে হয়েছে। সহযোগিতা দিতে বাধ্য হয়েছে। গ্রীমা জানতে এই ভয়ংকর অস্ত্রাগার শুধু মানুষের অকল্যাণ বয়ে আনবে, একদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে সবকিছু……এমন ধ্বংসকারী সৃষ্টির মহাপরিচালক মিঃ বর্মণকে ঘৃণা করতে মিস গ্রীমা।

পাগল শ্রমিকটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো মিস হ্যানরী গ্রীমা। তাজ্জব হয়ে গেছে সে একেবারে, আরও বিস্ময়াহত হলো যখন সেই পাগল শ্রমিক অদ্ভুতস্তূপে পরিণত করবে। বর্মণ তার নিজের সৃষ্টি দিয়ে নিজেই ধ্বংস হবে চিরতরে। অদ্ভুত সে হাসি আর কথাগুলো। গ্রীমা কিছু বলতে চায় কিন্তু পারে না।

বনহুর একবার মিস গ্রীমার দিকে তাকায় তারপর বলে-মহাথরো, সুড়ঙ্গমুখ উন্মুক্ত করে দিয়েছি, সমস্ত শ্রমিককে নিয়ে বেরিয়ে যাও। এদের ভালভাবে শৃংখলাবদ্ধ করেছে?

মহাথরো বললো– সর্দার, একচুলও নড়তে পারবে না এরা কেউ।

মহাথরো সর্দারের রিভলভারের মুখে বন্দী মিঃ বর্মণ এবং তার সঙ্গীদের মজবুত করে বেঁধে ফেললো। ওরা একটুও সুযোগ পেলো না বাধা দেওয়ার। বিশেষ করে মহাথরো অবাক হয়ে গিয়েছিলো, বনহুর পাগল শ্রমিক বেশে সুদীর্ঘ সময় ধরে এখানে এসেছে এবং সুকৌশলে সমস্ত কিছু জেনে নিয়েছে।

গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর–সাগরতীরে জাহাজ উল্কা অপেক্ষা করছে। পথ মুক্ত তুমি শ্রমিকদের নিয়ে বেরিয়ে যাও মহাথরো। দেরী হলে তুমিও মরবে এবং এখানে যে সব হতভাগ্য শ্রমিক নির্মম নিষ্ঠুরতার মধ্যে কাজ করছে তারাও প্রাণ হারাবে বোমার আঘাতে। যাও, আমি মিস গ্রীমাকে নিয়ে উড়ন্ত সসারে চলে আসছি…….

মহাথরো একবার তাকালো মিঃ বর্মণ ও তার সঙ্গীদ্বয়ের দিকে। এমন সূক্ষভাবে সর্দার জাল গুটিয়ে নিয়েছে ভাবতেই যেন বিস্ময় জাগে। মহাথরো সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলো সর্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে।

মিস গ্রীমা ও মিঃ বর্মণের দল হতভম্ব-তাদের মনে প্রশ্ন কে এই ব্যক্তি যার বুদ্ধিমত্তার কাছে তাদের এমন সুকৌশলভাবে বোমা তৈরির অস্ত্রাগারের গোপনতা উদ্ঘাটিত হলো। পরাজিত হলো তারা।

বনহুর গ্রীমাকে লক্ষ্য করে বললো–মিস গ্রীমা, আমি আগে জানতাম তুমিও এদের পার্টনার এবং দোষী কিন্তু এখানে এসে বুঝতে পেরেছি তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এসো তোমাকে। এই অভিশপ্ত পুরী থেকে উদ্ধার করি……গ্রীমার হাতখানা ধরে বেরিয়ে যায় বনহুর।

এক রকম প্রায় ছুটেই চলে বনহুর গ্রীমাকে নিয়ে।

গ্রীমার মুখে কোনো কথা নেই, তার মনে নানা প্রশ্ন আলোড়ন তুলছে।

*

ঘাটির সুকৌশলভাবে তৈরি সুড়ঙ্গপথ ধরে বাইরে বেরিয়ে আসে বনহুর আর গ্রীমা। ততক্ষণে ওদিকের গোপন পথে বেরিয়ে গেছে মহাথরো অসহায় নিঃসম্বল শ্রমিকদের নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাগরতীরে পৌঁছে যায় দ্রুতগামী ভ্যান নিয়ে।

উল্কার সিঁড়ি নামানো ছিলো। মহাথাবরী শ্রমিকদের নিয়ে জাহাজে উঠে পড়ে। ওদিকে উড়ন্ত সসারে চেপে বসে বনহুর আর গ্রীমা। একটা অদ্ভুত পোষাক পরিহিত ব্যক্তি বসে ছিলো ড্রাইভ আসনে। বনহুর আর মিস হ্যানরী গ্রীমা সসারে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পোষাক পরিহিত চালক সুইচ টিপলো। মুহূর্তে উড়ন্ত সসার উড়ে উঠলো আকাশে।

ওদিকে মিঃ বর্মণ ও তার সঙ্গীদ্বয়ের তখন চরম অবস্থা। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তার পরই তাদের জীবনাবসান ঘটবে। তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেদের মুক্ত করার জন্য কিন্তু তাদের সব চেষ্টা বিফল হলো। তারা তাদের হাত-পা'র বন্ধন একটু মুক্ত করতে পারলো না। তারা বুঝতে পারলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য। বনহুর তাদের সারা জীবনের সাধনায় তৈরি পারমাণবিক বোমার সুইচ চালু করে দিয়েছে, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড তাহলেই……

মিঃ বর্মণ ও তার সাথীদ্বয়ের চিন্তায় বাধা পড়লো মুহূর্তে দুলে উঠলো গোগুলো। উড়ন্ত সসার তখন আকাশের অনেক উপরে। বনহুর আর মিস গ্রীমা তাকিয়ে দেখলো গোথুলা দ্বীপটি তাসের ঘরের মত চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ছে। রাশি রাশি ধুম্রকুন্ড আর আগুনের লেলিহান শিখা কুন্ডলি পাকিয়ে উড়ে উঠছে উপরের দিকে। বজ্রধ্বনির মত আওয়াজ প্রকম্পিত করে তুললো গোথুলা দ্বীপের আকাশ বাতাস। বনহুরের চোখে বাইনোকুলার তাকিয়ে দেখছে সে গোখুলার ভূখন্ড তুলোধোনার মত ছিটকে পড়ছে তার দিকে।

বনহুর মিস হ্যানরী গ্রীমাকে লক্ষ্য করে বললো–মিস গ্রীমা, মিঃ বর্মণ ও তার সঙ্গীগণ তারই সৃষ্টির দ্বারা বিধস্ত হলো তারই অস্ত্রাগারের গহ্বরে। মিস গ্রীমা, তুমি ভাগ্যবতী বলতে হয়.......

মিস হ্যানরী গ্রীমা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো বনহুরের দিকে। অদ্ভুত একটা বিস্ময় ফুটে উঠেছে তার মুখে। বনহুরের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো তাকে যেন আরো বেশি বিস্ময়াভিভূত করেছে। এমনভাবে তার পাশে উপবিষ্ট অথচ ওকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হচ্ছে, ওর দু'চোখে যেন একটা তীক্ষ্ণদীপ্ত ভাব।

মিস হ্যানরী গ্রীমাকে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বেশ হাসি পেলো বনহুরের, অনেক মেয়ের চোখেই বনহুর এই ধরনের চাহনি দেখেছে তাই অবাক হলো না বনহুর। এখনও হ্যানরী গ্রীমা তাকিয়ে আছে, হয়তো সে ভাল করে বুঝতে চায় কেন তাকে বনহুর ভাগ্যবতী মনে করছে......তাই বললো বনহুর–তুমি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো মিস গ্রীমা?

হাঁ।

দেখলে অসৎ উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ কিভাবে বিনষ্ট হয়। মিঃ বর্মণ ও তার সঙ্গীগণ গোথুলা দ্বীপের ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে মিশে এখন সাগরগর্ভে তলিয়ে যাবে। ঐ দেখো মিস শ্রীমা, কিভাবে মিঃ বর্মণের এতদিনের সাধনার তৈরি পারমাণবিক বোমাগুলো সাগরের গভীর অতলে বাষ্ট হচ্ছে, তারই প্রচন্ড শব্দ এখানেও আমরা শুনতে পাচ্ছি।

উড়ন্ত সসারের নীলাভ আলো দীপ্তময় করে তুলেছে আকাশ-মন্ডলকে।

বনহুর আর গ্রীমা তখন মহাশূন্যে ভেসে চলেছে।

*

উল্কার উপরে প্রশস্ত ডেকের বুকে উড়ন্ত সসার নেমে পড়লো। উল্কার সমস্ত দেহটা তখন সাগরের গভীর অতলে, শুধু জেগে আছে উপরিভাগ। ঠিক একটি ভাসমান কচ্ছপের পিঠের মত মনে হচ্ছে। উড়ন্ত সসার যখন ভাসমান উল্কার পিঠে অবতরণ করলো তখন মিস হ্যানরী গ্রীমা আরও বিস্মিত হলো। যে ব্যক্তি তাকে ঐ কুচক্রী শয়তানদের কবল থেকে উদ্ধার করে আনলো সে সাধারণ ব্যক্তি নয়, এ কথা সে বেশ অনুধাবন করতে পারলো।

ধীরে ধীরে জাহাজখানা সম্পূর্ণ ভেসে উঠলো কান্দাই সাগরবক্ষে।

বনহুর আর গ্রীমা সসার থেকে নেমে দাঁড়ালো এবার, নামলো আলখেল্লা পরিহিত সসার চালকও।

বনহুর তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো–আন্তরিক ধন্যবাদ রাণী। এই মহাকর্মের জন্য তুমিই শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।

শুধু একটু মিষ্টি হাসির আওয়াজ ভেসে এলো আলখেল্লার মধ্য হতে।

সসারে উঠে বসলো বিস্ময়কর চালক।

তারপর মুহূর্তে উড়ন্ত সসার আকাশের বুকে মিশে গেলো।

বনহুর আর গ্রীমা জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে। অদ্ভুত এবং আশ্চর্য এ। জাহাজ। ভেতরে প্রবেশ করে মিস গ্রীমা হতবাক, গোথুলা দ্বীপের অস্ত্রাগারে যারা কাজ করতে তারা প্রায় সবাই এখানে। ওরাও মিস হ্যানরী গ্রীমাকে দেখে কম অবাক হয়নি।

মহাথরো গ্রীমাকে লক্ষ্য করে বললো–মিস গ্রীমা, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ আপনি সব সময় আমাদের প্রতি সদয় ছিলেন। আর সেই কারণেই সর্দার আপনাকে কৌশলে বাঁচিয়ে নিলো।

মিস গ্রীমার দু'চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। সুন্দর সুপুরুষ ঐ ব্যক্তিটির পরিচয় এখনও তার জানা হয়নি। কে এই মহাপুরুষ যার সাহস শক্তি বুদ্ধিমত্তা মিঃ বর্মণের মত কুবুদ্ধি সম্পন্ন নরপশুকেও পরাজিত করতে সক্ষম হলো।

সাংঘাতিক এবং ভয়ংকর পারমাণবিক অস্ত্রাগার ধ্বংসস্তূপেই শুধু পরিণত হয়নি, সাগরের গভীর অতলে তলিয়ে গেছে অস্ত্রাগারসহ সমস্ত গোথুলা দ্বীপ।

বনহুর মৃদু হেসে বললো–মিস গ্রীমা আর কোনো বিপদ বোধ হয় তোমাকে স্পর্শ করবে না। যাও বিশ্রাম করোগে......রহমান ওকে বিশ্রাম ক্যাবিনে নিয়ে যাও।

রহমান বললো–আসুন আমার সঙ্গে।

মিস গ্রীমা কোনো আপত্তি না করে রহমানের সঙ্গে এগিয়ে যায়।

একটি সুসজ্জিত ক্যাবিন।

দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা ক্যাবিনের দেয়ালে কয়েকটি সুন্দর দৃশ্যের ছবি আটকানো। মেঝেতে ভারী ভেলভেটের গালিচা বিছানো। একটি টেবিল ও একটি চেয়ার। চেয়ারটি ঘূর্ণায়মান। মূল্যবান কাঠের তৈরি।

মিস গ্রীমাকে ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে রহমান ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই গ্রীমা ডাকে-এই শোন!

রহমান থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়।

গ্রীমা বললো–যার নির্দেশে তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে তার পরিচয় আমি জানতে চাই।

রহমান হেসে বললো–মিস হ্যানরী, আপনি এখনও তার পরিচয় পাননি, এটা আপনার বোকামি। দু'দিন থাকলেই তার পরিচয় আপনা আপনি জানতে পারবেন।

না, আমি এক্ষুণি জানতে চাই, তুমি বলো?

সর্দার! আমাদের সর্দার দস্যু বনহুর........

বল কি!

হাঁ!

সত্যি বলছো?

সত্যি মিস হ্যানরী।

এই কারণেই আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম। বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর! ওর পরিচয় বিস্ময়কর বটে। তারপর আপন মনেই বলে গ্রীমা, আমি প্রথমেই অবাক হয়েছিলাম তার আচরণে। তার কার্যকলাপ দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। যে দস্যু বনহুর মানুষের আতঙ্ক, যে দস্যু বনহুর মানুষের পরম শ্রদ্ধার পাত্র, যাকে দেখার জন্য মানুষ উদগ্রীব সেই বনহুরের পাশে আসতে পেরেছে হ্যানরী গ্রীমা। খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো।

রহমান ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো। সে বুঝতে পেরেছে তার সর্দারকে মিস গ্রীমা এতক্ষণে চিনতে পেরেছে।

একটু পরেই গ্রীমার জন্য খাবার এলো।

শ্রীমা ততক্ষণে শুভ শয্যায় দেহ এলিয়ে দিয়ে ভাবছিলো বনহুরকে। বনহুর ওকে দেখেছে তবুও আবার নতুনভাবে পরিচয় করতে চায় শ্রীমা, দেখতে চায় সেই মানুষটিকে।

খাবার খেতে খেতেও ঐ কথা ভাবছে গ্রীমা, সুন্দর পৌরুষদীপ্ত একটি মুখ। অদ্ভুত তার চোখ দুটি, ললাটে গভীর চিন্তারেখা। গ্রীমা সহানুভূতি নিয়ে পাগল শ্রমিকটিকে তার কাজ লাঘব করার জন্য গোথুলা অস্ত্রাগারে মিঃ বর্মণকে বহুবার অনুরোধ জানিয়েছিলো। আজ হাসি পায় গ্রীমার, বনহুরের ছদ্মবেশ শুধু তাকেই নয়, মিঃ বর্মণের দলকেও ভীষণ জব্দ করে দিয়েছে। বনহুর ছাড়া ঐ পারমাণবিক অস্ত্রাগার ধ্বংস করার ক্ষমতা কোনো সাধারণ মানুষের ছিলো না। মিস গ্রীমার মনটা যেন অনেকটা হাল্কা হয়েছে, মিঃ বর্মণ এমন একটা সৃষ্টির নেশায় মেতে উঠেছিলো যা বিশ্ব জনমানবের জীবনের ভয়ংকর একটা অভিশাপ হিসেবে নেমে আসতো। খেয়ে উঠে বিছানায় মিস গ্রীমা গা এলিয়ে দিয়ে ভেবে চলে অনেক কথা।

তখন বনহুর তার নিজের বিশ্রাম ক্যাবিনে প্রবেশ করে।

ড্রেস পরিবর্তন করেই বিশ্রাম ক্যাবিনে এসেছে।

বনহুর প্রবেশ করতেই নূরী এসে দাঁড়ায়, তার মুখমন্ডল প্রসন্ন। বললো নূরী- তুমি নতুন একটা আমদানী জোগাড় করলে কোথা থেকে? জাভেদকে অসুস্থ অবস্থায় পাঠিয়ে তুমি……

বললো বনহুর–বলতে চাও আমি তার জন্য না ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম?

জানি, সব শুনেছি মহাথরোর কাছ থেকে।

তবে নতুন একটা আমদানী, কি বোঝাতে চাও? একথাটা মহাথরো বলেনি তোমাকে?

অতোশতো বলার সময় বা শোনার সময় হয়নি।

বনহুর বললো–যতটুকু জানোনা ততটুকু জানতে পারবে নূরী। বেচারী বড় অসহায়…..

নূরী গম্ভীর গলায় বললো–তোমার কাছে নারীজাতি সকলেই অসহায়। এখানেই তোমার দুর্বলতা, বলো সত্যি বলিনি?

হাসলো বনহুর, তারপর বসলো বিছানায়, বললো–তুমি নিজেও তো নারী, কাজেই এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ভালভাবেই অনুধাবন করেছ নূরী।

আমার বেলাতেই তুমি ছিলে ব্যতিক্রম। তুমি সব সময় আমার ওপর অবিচার করেছে হুর। এতদিন আমি যা ভাবতাম তা মিথ্যা। বিদেশিনী একটি মেয়ে তোমার হৃদয় জয় করবে ভাবতে পারিনি।

তোমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভুল নূরী। একটু গভীরে তলিয়ে ভাবলে তোমার ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে। বসো কথা আছে তোমার সঙ্গে।

হা। বসো।

নূরী স্বামীর শয্যার পাশে বসে ঘনিষ্ঠ হয়ে, তারপর বনহুরের হাতের ওপর হাত রেখে বলে- আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আছে তোমার!

নূরী, তুমি বড্ড অভিমানিনী আজও তুমি আমাকে চিনতে পারলে না। জানি তোমরা মেয়েরা সব সময় পুরুষকে অবিশ্বাস করো। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অহেতুক,

অনেক সময় এমন এক একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যা কিছুটা অভাবনীয়। যেমন মিস হ্যানরী শ্রীমাকে তার সঙ্গীদের সঙ্গে বিধ্বস্ত না করে কৌশলে উদ্ধার করে আনতে হলো।

যে নারী তার সঙ্গ-সহায়তা দিয়ে একটা জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিলো, তাকে তুমি তুলে আনলে সুকৌশলে তোমার আশ্রয়ে। একটু ভেবে দেখলে না সে তোমার সর্বনাশ করবে কি না বা করতে পারে কিনা।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর, বললো–তুমি দেখছি গভীরে তলিয়ে ভাবতে শিখেছো নূরী। তোমার চিন্তাধারাকে অভিনন্দন জানাই......একটু থেমে বললো বনহুর–নূরী, বলল জাভেদ কেমন আছে?

আস্তানায় যাবে না তুমি?

যাবো তবুও শুনতে চাই তোমার মুখে।

অনেকটা সুস্থ সে এখন। সত্যি হুর, তুমি ঠিকমত এবং সময় মত কাজ করতে না পারলে জাভেদকে আর ফিরে পেতাম না। জাভেদ কেন এমন কাজ করতে গিয়েছিলো! কে তাকে এমন কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলো?

সবই তোমার জানার কোনো প্রয়োজন নেই নূরী।

বেশ, আজ থেকে কোনো কথাই জানতে চাইবে না। অভিমান ভরা কণ্ঠ নূরী।

বনহুর নূরীর চিবুকটা উঁচু করে ধরে বলে-অপূর্ব লাগে তোমাকে যখন তুমি অভিমান করো।

এমন অনেক কথাই শুনেছি তোমার মুখে।

বনহুর আবেগভরে ওকে টেনে নেয় কাছে।

নূরী স্বামীর বুকে মাথা রাখে। অফুরন্ত আনন্দে ভরে ওঠে তার মন। অনেকদিন সে স্বামীকে এমন করে কাছে পায়নি। নূরী কেমন করে এত দিন স্বামীর সান্নিধ্য ছেড়ে ছিলো নিজেই ভাবতে পারে না। যে বনহুরকে এক মুহূর্ত না দেখলে নূরীর মন অস্থির হয়ে উঠতো-আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতো, কিছুই ভাল লাগতো না তার,

আর সেই নূরী সুদীর্ঘ সময় বনহুরকে ছেড়ে কাটিয়েছে, বনহুরের স্মৃতি মন্থন করে বেঁচে ছিলো সে। যেদিন নূরী জানতে পেরেছিলো বনহুরকে মিশরীয় সরকার পিরামিডের অভ্যন্তরে বন্দী করে রেখেছিলো সেইদিন থেকে নূরীর চোখের নিদ্রা দূর হয়ে গিয়েছিলো। সব সময় বসে বসে ভাবতে, আর কোনোদিন বনহুরকে ফিরে পাবে কিনা। যদিও তার মন ডেকে বলতো, বনহুরের কোনো অমঙ্গল হতে পারে না, কারণ সে কারও অন্যায়ভাবে ক্ষতি করেনি। যারা অপরের সর্বনাশ করে, যারা অপরের ক্ষতি সাধন করে নিজেদের ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তুলেছে, বনহুর তাদের ঐশ্বর্য লুটে তাদের রক্ত শুষে নিয়েছে এবং যারা অসহায় অনাথ তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। ক্ষুধার্তদের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে বস্ত্রহীনদের মধ্যে বস্ত্র দিয়েছে। বনহুরকে যত দেখেছে ততই বিস্মিত হয়েছে, বনহুর নূরীর জীবনে পরম সম্পদ।

কি ভাবছো নূরী? বললো বনহুর।

নূরীর দুচোখে অশ্রু, মাথা নিচু করে নেয় সে, কোনো জবাব দেয় না।

বনহুর বললো–তুমি কাঁদছো নূরী! কেন, কি হয়েছে তোমার?

কিছু না।

তবে তোমার চোখে পানি কেন?

জানি না।

নূরী, তুমি তো এমন ছিলে না। আমি জানতাম তুমি ধৈর্যশীলা। সমস্ত আঘাত তুমি ধৈর্যের সঙ্গে সয়ে যেতে পারো। আজকাল তুমি যেন কেমন পাল্টে গেছে।

আমি পাল্টে যাইনি হুর, পাল্টে গেছো তুমি। আগের মত তুমি নেই। তার মানে?

আজকাল কোথায় থাকো, কেমন থাকো কি করো কিছু আমাকে জানাও না। আমি কি তোমার কেউ না?

নূরী, মিছামিছি রাগ করো-তুমি কি নতুন এসেছে আমার পাশে? জীবনে আমি তোমাদের অভিশাপ-এ কথা কেন ভুলে যাও নূরী? বনহুরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, শান্ত।

নূরী বুঝতে পারে বনহুর তার কথায় দুঃখ পেয়েছে, তাই নূরী চোখের পানি মুছে বলে-তুমি তো জানো তুমি আস্তানা ছেড়ে চলে গেলে আমি মনে বড় কষ্ট পাই। তা ছাড়া তোমার অনুচরগণ বড় অশান্তিতে দিন কাটায়। শুধু তারাই নয়, তোমার অশ্ব তাজ……

জানি নুরী, আমি জানি আর জানি বলেই আমার এত দুঃখ। তোমরা সবাই আমাকে ভালোবাসো তবুও পারি না আমি তোমাদের খুশি রাখতে। নূরী, যে কথা বলার জন্য তোমাকে বসতে বললাম সেই কথা শোন। যে মেয়েটিকে আমি গোধুলা দ্বীপের ভয়াল বিস্ফোরণ থেকে উদ্ধার করে এনেছি সেও মিঃ বর্মণের শিকার, যেমন তার কারখানার বন্দী শ্রমিকগণ ঠিক তেমনি সেও। শ্রমিকগণ যারা এখন উল্কায় অবস্থান করছে তারা সবাই একই দেশের নাগরিক নয়। তারা বিভিন্ন দেশবাসী, তাদেরকে বহু কৌশলে আমি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি-হয়তো মহাথরোর মুখে সবই শুনেছো। .

হাঁ, মহাথরো গোথুলা দ্বীপ সম্বন্ধে সবকিছু বলেছে। সত্যি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই এমন দুঃসাহসিক কাজ তুমি করতে পেরেছে হুর!

সেই বিস্ফোরণ দৃশ্য যদি দেখতে নূরী তুমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতে। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি কারখানায় বেশ কিছু পারমাণবিক বোমা তৈরির কাজ সমাধা হয়েছিলো। সেগুলো একদিন বিস্ফোরণ ঘটানো হতো এই বিশ্ববাসীকে ধ্বংস করতে। সে সুযোগ আমি তাদের দেইনি নূরী। হাঁ, বিলম্ব না করে আমি বিধ্বস্ত করতে পারতাম অতি অল্প সময়ে কিন্তু তাতে বহু অসহায় মানুষ যারা করুণ নির্মম অবস্থায় সেই ভয়ংকর কারখানায় কার্জে নিয়োজিত ছিলো তারা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো। একটি প্রাণীও প্রাণে বাঁচতো না। তাই আমি তা করিনি, চেয়েছি নিরপরাধ শ্রমিকদের উদ্ধার করতে এবং মহাথরোর সহায়তায় তা করতে পেরেছি। একটু থামলো বনহুর, তারপর বলতে শুরু করলো আবার-রাণীর কাছে এ ব্যাপারে আমি কৃতজ্ঞ। আমি ওয়্যারলেসে রাণীকে জানিয়েছিলাম এবং গোগুলা অস্ত্রাগার ঘাটির একটি ম্যাপ, তাকে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলাম, তাই রাণী নিজে সহায়তা করতে পেরেছিলো আর তার এই সহায়তা আমাকে অসম্ভব একটি কাজকে সম্ভব করে তুলতে সক্ষম করেছে। জানো নূরী, মিস হ্যানরী গ্রীমা ঐ অসহায় শ্রমিকদেরই মত নিঃস্ব নিঃসম্বল একটি অসহায় নারী। আজ ও কোথায় যাবে জানে না, কারণ সেই নরপশুর দল তাকে তুলে এনেছিলো তার কর্মস্থল থেকে।

কি করতে হবে বলো?

কিছু না, শুধু তুমি ওকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমার সঙ্গে রাখবে.....।

এই কথা বলার জন্য তুমি উদগ্রীব ছিলে?

হাঁ, কারণ আমাকে কিছুদিনের জন্য ভারত যেতে হচ্ছে.....

ভাল পিয়ানো বাজাতে জানো বলে আমন্ত্রণ এসেছে বুঝি?

না আমন্ত্রণ নয়, আর পিয়ানো বাদক হিসেবেও নয়, সে এক করুণ ব্যাপার। আবার আমাকে নতুন এক সংগ্রাম হাতছানি দিয়ে ডাকছে নূরী।

এসব কি বলছে হুর?

হাঁ সত্যি। ভারতে কোনো এক কুচক্রী শয়তান দল মাথার খুলির ব্যবসা করছে সুদীর্ঘ। সময় ধরে।

মাথার খুলির ব্যবসা-বলো কি?

ঐ মাথার খুলি বয়স্ক ব্যক্তিদের নয়, শিশুদের মাথার খুলি।

সত্যি!

সত্যি নূরী সত্যি, আর বড় করুণ। আমি সমস্ত ঘটনা অবগত হয়েছি-প্রতি সপ্তাহে একশ' হতে পাঁচশ' নিরীহ অসহায় শিশু ধরে এনে তাদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তারপর সেই কচি মাথাগুলোকে সেদ্ধ করে চামড়া ছাড়িয়ে প্যাকিং করা হয়, এরপর সেগুলোকে ফলের বাক্স হিসেবে চালান দেওয়া হয় বিদেশে।

বল কি হুর!

হাঁ, সত্যি এবং এই মাথার খুলির ব্যবসা করে ভারতের কোনো কোনো ব্যবসায়ী মহল লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটছে।

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না হুর। এত বড় হৃদয়হীন মানুষও আছে! জানতাম……

বলো থামলে কেন?

মানুষ হত্যা করতে তোমার হাত এতটুকু কাঁপেনি কোনোদিন।

নূরী, তুমি আজও আমাকে সঠিক চিনতে পারোনি আর পায়রানি বলেই এমন কথা। বলতে পারলে। তারপর হঠাৎ বনহুর চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লো।

বললো নূরী-কি ভাবছো? আমি তোমাকে রূঢ় কথা বলেছি বলে? রাগ করোনা লক্ষীটি!

তোমার কথা নিয়ে ভাবার সময় কোথায়। ভাবছি ঐ নরপশুদের কথা। অচিরেই আমাকে ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে সেই নরমুন্ড ব্যবসায়ীদের ঘাটি।

তুমি ভারতে যেতে মনস্থির করে ফেলেছে হুর?

হুঁ নূরী।

এবার আমি যাবো তোমার সঙ্গে।

হাসলো বনহুর।

নূরী বললো–হাসছো যে?

এ দেশ ছেড়ে ভারত বহুদূরে, সেখানে তোমাকে সঙ্গে নেওয়া বড় কঠিন।

আমি জানি তোমার কাছে কিছুই কঠিন নয়।

তা হয়তো নয় কিন্তু সমীচীন হবে না এখন এ মুহূর্তে। আমাকে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, কাজেই…..

বুঝতে পেরেছি তুমি রাজি নও আমাকে সঙ্গে নিতে। বেশ যাও, তবে যাবার পূর্বে একবার কান্দাই গিয়ে মনিরা আপনার সঙ্গে দেখা করে যেও।

হয়তো সম্ভব হবে না। মায়ের মৃত্যুর পর হতে কান্দাই পুলিশ মহল চৌধুরীবাড়ীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

হাঁ, এ কথা অবশ্য আমি রহমান ভাইয়ের মুখে শুনেছি। সে কথা শোনার পর থেকে সব সময় দুশ্চিন্তায় আছি।

দুশ্চিন্তা কেন?

যদি আবার তুমি কোনো বিপদে পড়ো।

আবার তুমি হাসলে নূরী। জানতো বিপদকে আমি ভয় পাই না। তা ছাড়া আমি চাই সেই নরপশু যারা শিশু মস্তকের ব্যবসা করছে তাদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের ব্যবসা আরও জোরদার করতে। একটু ভেবে বললো বনহুর– এদের ব্যবসা কেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজে বের করতে আমাকে বেশি বেগ পেতে হবে না নূরী। তবে তুমি বলছো যখন আমি ভারত সফরে যাবার পূর্বে মনিরার সঙ্গে দেখা করে যাবো।

তুমি যে বললে পুলিশ তোমার সন্ধান করে ফিরছে। যদি গিয়ে আবার গ্রেফতার হও তাহলে তোমার কাজ ব্যাহত হবে। তবে একটি প্রশ্ন করি তোমাকে?

বলো?

কান্দাই প্রশাসন বিভাগ এবং মিশর সরকার যুক্ত প্রচেষ্টায় তোমাকে এক করুণ মুহূর্তে বন্দী করেছিলো এবং মিশরের পিরামিডের অভ্যন্তরে তোমাকে বন্দী করে রেখেছিলো। তারা জানে তুমি আজও সেই পিরামিডের গহ্বরে আটক আছে।

না। তুমি জানো না নূরী তারা সবাই জানে আমাকে মিসরীয় পিরামিড আটকে রাখতে পারেনি। আমি সেই মৃত্যুগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

বলো কি হুর!

হাঁ নূরী, কোনো কথাই কোনো সময় গোপন থাকে না। তা ছাড়া আমি আমার সম্বন্ধে কিছুই গোপন রাখতে চাইনি চাই না, একথা তুমিও জানো।

জানি তুমি যাকে হত্যা করবে তাকেও তুমি চিঠি দিয়ে সাবধান থাকতে বলল, কাজেই জানি তুমি কিছু গোপন রাখতে চাও না। তুমি পিরামিডের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে এ কথা তাহলে কান্দাই পুলিশমহল জেনে নিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে মিশর সরকার কান্দাই সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। কাজেই বুঝতে পারছ। তারপর থেকে সর্বক্ষণ নজর রেখেছে চৌধুরী বাড়ির উপরে।

কাজ নেই তোমার গিয়ে। নূরী স্বামীর জামার বোম লাগিয়ে দিতে দিতে বললো–তুমি তো এমন কোনো কাজ করোনি হুর যার জন্য পুলিশমহলের কাছে দোষী! পুলিশ যা পারে, সবার অগোচরে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব অন্যায় অনাচার চলেছে, যে দুষ্কর্ম হচ্ছে সে সব দমন করার ক্ষমতা নেই অন্য কারো, অন্য কেউ নেই যে অনাচার অন্যায়কে প্রতিহত করে। জানি না কেন, কেন পুলিশ মহল তোমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এত আগ্রহী। তাদের কি বোঝার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে.....

এমন সময় রহমান ক্যাবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে বলে-সর্দার।

বনহুর বুঝতে পারে রহমান কিছু সংবাদ বহন করে এনেছে, তাই সে বললো–এসো!

রহমান এসে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো–জাহাজ এসে গেছে সর্দার। এবার কি ওদেরকে জাহাজ ফিরুতে উঠিয়ে নেবো?

হাঁ। ওদের প্রয়োজনীয় খাবার এবং পানি তুলে নিও। জাহাজ কান্দাই সাগর ধরে জবরু হয়ে ঝাম বন্দরে যাবে, সেখানে তুমি ওদের সবাইকে নামিয়ে দিও। ওখান থেকে যে যার আশ্রয়ে ফিরে যাবে।

সর্দার, কিছু কিছু অর্থ দিতে হবে যেন ওরা বাড়ি ফেরার খরচ বহনে অসুবিধায় না পড়ে।

হাঁ, যার যত অর্থ প্রয়োজন দিয়ে দিও। ওরা বড় অসহায়, দীর্ঘদিন ধরে গোধুলায় আটক অবস্থায় কঠোর পরিশ্রম করেছে।

আপনার আদেশ সঠিকভাবে পালন করবো। কুর্ণিশ জানিয়ে চলে যায় রহমান।

নূরী বললো–কাদের পাঠাচ্ছো হুর?

যাদের মুক্ত করে এনেছি গোধুলা দ্বীপের সেই মৃত্যুভয়াল অবস্থা থেকে। ওরা সবাই মারা পড়তে, কারও কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো না। ওরা বড় অসহায়, নির্যাতিত।

তুমি যেভাবে ব্যবস্থা নিয়েছ তাতে ঠিকমত তারা নিজ নিজ পরিবার পরিজনের নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হবে তো?

হাঁ, আমি সেইভাবেই ব্যবস্থা নিয়েছি নূরী। সত্যি এতগুলো প্রাণ বিনষ্ট হতো। আমি আল্লাহতায়ালার সহায়তায় সফলকাম হয়েছি এ জন্য আমি গর্বিত। বিশেষ করে পারমাণবিক বিষাক্ত বোমাগুলো ধ্বংস করতে পেরেছি, ঐ বোমাগুলো একদিন বিশ্ববাসীর সন্ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াতো-নাগাসাকি-হিরোশিমার যে অবস্থা হয়েছে সেই অবস্থায় পরিণত হতে গোটা পৃথিবী। তারপর কিছু চিন্তা করা যায় বলো?

সত্যি তুমি বিশ্বজয়ী হুর! তোমার দুর্জয় সাহসকে অভিনন্দন জানাই।

বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে বলে-তোমার প্রেরণাই আমাকে দুর্জয় সাহসী করেছে।

*

শিমলা কালী মন্দিরের তলদেশে ভূগর্ভ একটি বৃহদাকার কক্ষ। প্রায় পাঁচ শ শিশু এই কক্ষে আটক রাখা হয়েছে। দু’জন গুর্খা প্রহরী প্রহরায় আছে সেখানে, তারা মাঝে মাঝে শুকনো বিস্কুট অথবা রুটি শিশুদের মধ্যে পরিবেশন করছে। একটি ড্রামে কিছু পানি রাখা হয়েছে, মগ দিয়ে পানি তুলে শিশুদের মুখে অথবা আঁজলায় ঢেলে দেওয়া হচ্ছে।

একটি বদ্ধ কক্ষে এতগুলো শিশু, কেউ বা কাঁদছে, কেউ বা ঘুমিয়ে পড়েছে ক্ষুধার জ্বালায়, কেউ বা চিৎকার করে মা মা বলে ডাকছে। সবাই দু’তিন বছর বয়স থেকে আট নয় বছর বয়সের হবে। কারও পোশাক আশাখ জামা-কাপড় দেখে মনে হয় কোনো অভিজাত ঘরের ছেলে আবার অনেকে আছে স্বাভাবিক মধ্যবিত্ত পরিবারের। আবার অনেকে কৃষক শ্রমিকদের সন্তান।

শিশুদের দেখলেই বোঝা যায় তারা যেমন বিভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছে তেমনি বিভিন্ন দেশীয়। বিশ্বের নানা দেশ থেকে এদের আমদানী করা হয়েছে। এক একটি শিশুর মুখ।

দেখলে বড় মায়া হয়, বড় করুণ হৃদয়স্পর্শী তাদের চেহারা। জামা-কাপড় মলিন, চুল রুক্ষ এলোমেলো। চোখের নিচে কালিমার চিহ্ন। চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে এখন তারা নেতিয়ে পড়েছে। গলা দিয়ে কান্না বের হয় না।

এখানে যে মালামাল আসে তা বিভিন্ন দেশ থেকে। কোম্পানীর এজেন্ট আছে, তারা মালামাল জমা দেয় লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে।

কোম্পানীগুলোর মালিক বিভিন্ন স্থানে গোপন আস্তানায় বসে তাদের কাজ চালিয়ে যায়। পার্টনার এবং এজেন্টগণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে এদের কোম্পানীর শাখা আছে। বাইরের দেশ থেকে যে শিশুদের চালান আসে তা অতি গোপনে। ভারতের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এসব কোম্পানীর মালিকগণ এক একজন কোটি কোটি টাকার মালিক। সবচেয়ে বড় কোম্পানী হলো শিমলাঘাটা।

শিমলাঘাটা কোম্পানীর মালিক আওরাংনাথ, সবচেয়ে ধনবান ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি। মস্তক ব্যবসা করে মাসে সে এত অর্থ রোজগার করে যার তুলনা হয় না। পার্টনারদের মধ্যে আওরংনাথ যেমন ধনকুবের তেমনি স্বাস্থ্যবান। তার একমাত্র সন্তান দেবনাথ। বহু সাধনার পর আওরং নাথ একমাত্র সন্তান দেবনাথকে পেয়েছে। ফুলের মত সুন্দর ফুটফুটে দেবনাথ বাবা-মা'র নয়নের আলো।

বয়স তার সবে সাত বছর। সদা হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তময়। এক মুহূর্ত দেবনাথকে দৃষ্টির আড়াল করে না আওরংনাথ ও তার স্ত্রী বাসন্তি দেবী। বাইরে লোকচক্ষুর অন্তরালে দেবনাথকে লালন পালন করতে থাকে বাবা-মা। এত ঐশ্বর্য ধনদৌলত একমাত্র সন্তান দেবনাথের এবং তারই জন্য রাজ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য গড়ে তুলছে আওরাংনাথ।

দেবনাথের জন্য বাগানবাড়িতে নানা জাতীয় খেলার আয়োজন করেছে আওরাংনাথ। দোলনা বহু রকম, ঘোড়া, গাড়ি, চাকা, বেলুন, নানা ধরনের খেলার সরঞ্জাম। পানির ফোয়ারা ভারী সুন্দর, নিচে সুইমিং পুল, ট্রেন, মোটর ঘোড়াগাড়ি সবই ছোট্ট বাচ্চা দেবনাথের জন্য। অগণিত দাসদাসী-কেউ তাকে স্নান করায়,

কেউ জামাজুতো পরায়, কেউ বা তার সঙ্গে খেলা করে, আবার কেউ ঘুম পাড়ায় ঘুমপাড়ানীর গান গেয়ে।

আওরংনাথের গাড়ি কয়েকখানা।

যখন যে গাড়িতে চাপতে ইচ্ছা করে আওরংনাথ, সেই গাড়ি বের করার আদেশ দেয়।

কোম্পানীর কাজে ব্যবহার করে কালো আবলুস রঙের গাড়ি খানা। রাতের অন্ধকারে গাড়িখানা মিশে যায় যেন। এ গাড়ি নিয়েই আওরংনাথ শিমলাঘাটা কোম্পানীতে যায়। অন্যান্য দিনের মত আজও আওরং নাথ শিমলাঘাটা গেলো। মালামাল দেখার জন্য তাকে প্রায়ই আসতে হত শিমলাঘাটায়।

আজও শিমলাঘাটা কালী মন্দিরে এলো আওরংনাথ। তার সহকারী বীরেন্দ্রনাথও এসেছে।

কালী মন্দিরের ঘন্টা বেজে উঠলো।

দরজা বন্ধ ছিলো, খুলে গেলো।

আওরংনাথ ও তার সঙ্গী বীরেন্দ্রনাথ গাড়ি থেকে নেমে মন্দিরে প্রবেশ করলো।

দরজা বন্ধ হলো।

কালী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে করজোড়ে প্রণাম করলো আওরংনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ দেবীমূর্তিকে, তারপর পা দিয়ে চাপ দিলো মেঝের একস্থানে। সঙ্গে সঙ্গে কালীমূর্তি একপাশে

সরে গেলো, বেরিয়ে এলো একটি সুড়ঙ্গপথ।

আওরংনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ কালীমূর্তির পেছনের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে নিচে নেমে গেলো। কিছুটা যাবার পর সেই কক্ষ, যে কক্ষে আটক করে রাখা হয়েছে পাঁচশ শিশুকে।

আওরংনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ কক্ষের নিকটে গিয়ে ভালভাবে শিশুদের লক্ষ করলো, খুশিতে ডগমগ হলো ওরা। কোটি কোটি টাকার মালামাল এসে গেছে।

তাদের শাখাগুলোর লোক ঠিকভাবে মাল পরিবেশন করছে, কোনো অসুবিধা নেই। আনন্দে উচ্ছল আওরংনাথের মুখ। একটি শিশু, সবচেয়ে বয়স কম, মা মা বলে কাঁদছিলো তখন আওরংনাথ প্রহরীকে ডেকে বললো, রহমত খাঁ-ওটাকে আগে সরাবে। নইলে অন্যগুলোও ঘাবড়ে যাবে। হাঁ শোন রহমত

হাঁ, আগের মালামাল পরিষ্কার করা হয়েছে?

হাঁ, মালিক কিছু মাল পরিষ্কার করে প্যাকেট করা হয়েছে। কিছু সেদ্ধ হচ্ছে, সেগুলো দুদিনের মধ্য পরিষ্কার করা হয়ে যাবে মালিক।

রাঘব ডোম ঠিকমত কাজ করছে।

হাঁ, রাঘব ডোম তার সাতজন সঙ্গী নিয়ে কাজ করছে। প্রতিদিন প্রায় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটা মাল তারা তৈরি করে দিচ্ছে।

আওরংনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ এগিয়ে যায় অন্যদিকে, অপর এক জায়গায় বিরাট আকার ডেকচিতে প্রায় পঁচিশটি কাঁচা মাথা সেদ্ধ করা হচ্ছে। মাথাগুলো সেদ্ধ করার পর অন্য একস্থানে সেগুলো থেকে চামড়া ছাড়ানো হচ্ছে। ছুরি দিয়ে মাথার চামড়াগুলো পরিষ্কার করে ছাড়িয়ে নেবার পর, সাবান আর সোডা দিয়ে ধোয়া হচ্ছে, তারপর শুকনো কাপড়ে মুছে নিয়ে সেগুলোতে ওষুধ মাখানো পাউডার জাতীয় পদার্থ মাখিয়ে গুছিয়ে রাখছে। এরপর ওষুধ মাখানো মাথাগুলোকে কাঠের বাক্সে প্যাকিং করা হচ্ছে। উপরে কিছু আপেল এবং নাশপাতি ফল সাজানোর পর প্যাকিং করা বাক্সগুলোকে লোহার পেরেক দিয়ে মজবুত করে আটকানো হচ্ছে তারপর বাক্সগুলোর গায়ে ফলের ছবিসহ লেবেল সরানো হচ্ছে।

সপ্তাহে একবার করে আওরংনাথ নিজে এসে এসব তদন্ত করে দেখে। তারপর এসব বাক্স চালান যায় দেশ বিদেশে। আসে কোটি কোটি টাকা।

আওরনাথের কোম্পানী জোরেশোরে ভাবে চলছে।

ড্রাইভার দক্ষ অভিজ্ঞ।

নতুন হলেও বিশ্বাসী ড্রাইভার। জাতিতে শিখ, মাথায় পাগড়ি মুখ ভরা দাড়ি-গোঁফ, চোখে কালো চশমা। শরীরে ঢিলা জামা-পাজামা। আওরংনাথ ওকে বিশ্বাস করে। অবশ্য বিশ্বাসের কারণ আছে, শিখ ড্রাইভার আসার পর বিভিন্ন

কাজে সুফল লাভ করেছে আওরংনাথ। সেদিন ভুলে হলঘরে প্রায় দু'লাখ টাকার একটি ব্যাগ রেখে আওরংনাথ বেরিয়ে গিয়েছিলো। কিছু আনার জন্য হলঘরে প্রবেশ করে শিখ ড্রাইভার রজত সিং। তার ব্যাগটা নজরে পড়ে যায়, তুলে নিয়ে আসে এবং আওরংনাথকে দিয়ে সেলাম জানায়।

আওরংনাথের প্রচুর অর্থ ধনসম্পদ থাকলেও অর্থের মোহ তার ছিলো এবং এ কারণেই রজত সিং দু'লাখ টাকা সহ ব্যাগটা এনে দেওয়ায় বেশ খুশি হয়েছিলো সেদিন সে। অবশ্য এরপরও বহু কাজে রজত সিংয়ের বিশ্বাসযোগ্য কাজের প্রমাণ পেয়েছে আওরংনাথ।

অল্পভাষী শিখ ডাইভারটিকে ভালও বেসে ফেলেছে আওরংনাথ। কথা কম বললেও কাজে দক্ষ রজতসিং। আরও একদিন গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলো রজত সিং। গাড়িতে ছিলো আওরনাথ ও তার দুজন সহকারী। জাহাজে মাল তুলে টাকা নিয়ে ফিরছিলো তারা। প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা ছিলো তাদের সঙ্গে। গাড়ি খানা যখন বন্দর ত্যাগ করে এগিয়ে চলেছে তখন পথের বাঁকে একটা জমকালো গাড়ি তাদের গাড়ির পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

রাত তখন গভীর।

নির্জন পথ। গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো রজতসিং।

সবাই ঘিরে ফেললো আওরংনাথের গাড়িখানাকে। আওরংনাথও তার সঙ্গীদের নিকটে রিভলভার ছিলো কিন্তু তারা তাদের অস্ত্র বের করার সুযোগ পেলো না। কারণ দুস্কৃতিকারীগণের প্রত্যেকের হাতেই ছিলো আগ্নেয়াস্ত্র। তারা সবাই তা বাগিয়ে ধরে আক্রমণ করলো, কারণ তারা জানে আওরংনাথের সঙ্গে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আছে।

দুস্কৃতিকারীগণ এগিয়ে আসতেই ড্রাইভ আসন থেকে রজত সিং নেমে দাঁড়ায়। ততক্ষণে দুস্কৃতিকারীগণ আওরংনাথ ও তার সঙ্গীদ্বয়কে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে ফেলেছে, একজন রিভলভার চেপে বললোটাকাগুলো দিয়ে জীবন বাঁচাও, নইলে মরবে......

কথা শেষ হয় না দুস্কৃতিকারীটির।

রজত সিং পেছন থেকে হাত চেপে ধরে এবং কৌশলে দুস্কৃতিকারীর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেয়, তারপর লাগায় প্রচন্ড ঘুষি। রজত সিংয়ের এক একটা ঘুষিতে এক একজন দুস্কৃতিকারী পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। তাদের হাতের রিভলভার ছিটকে পড়ে দূরে।

রজত সিং একা আর চার পাঁচজন দুষ্কৃতকারী কিন্তু ওরা পেরে ওঠে না। পর পর মার খায় ওরা। হাতের রিভলভার হাতছাড়া হয়ে গেছে। রজত সিংয়ের মুষ্ট্যাঘাতে নাকেমুখে রক্ত ঝরে। কিছুক্ষণের মধ্যে দুস্কৃতিকারীগণ পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

আওরংনাথ ও তার সঙ্গীদ্বয় হতবাক, রিভলভার সঙ্গে থাকতেও তারা দুস্কৃতিকারীদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারতো না যদি রজত সিং না থাকতো। রজত সিংয়ের জন্য আজ লক্ষ লক্ষ টাকা রক্ষা পেলো? আওরংনাথ বাসায় ফিরে রজত সিংকে বখশীস স্বরূপ এক লক্ষ টাকা দিতে যায় কিন্তু রজত সিং তা গ্রহণ না করে শুধু বলেছিলো মালিক, টাকার জন্য কাজ করি না। কাজ করি প্রাণের টানে।

আওরংনাথের সমস্ত প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিলো, এমন একজন বলিষ্ঠ শক্তিবান লোকই তার প্রয়োজন। রজত সিং শুধু শক্তিশালীই নয়, বিশ্বাসীও বটে।

রজতসিংসহ ফিরে আসে আওরংনাথ। মন তার পরিতৃপ্ত, ব্যবসায় সফলতা তার জীবনকে করেছে ধন্য। নিঃসন্তান ছিলো আওরংনাথ, তার কামনা ছিলো একটি সন্তানের। প্রৌঢ় বয়সে তাদের কোল জুড়ে এসেছে তাদের কামনার ধন দেবনাথ। আওরংনাথ হলঘরে প্রবেশ করতেই ছুটে এলো দেবনাথ-বাবা, বাবা কোলে নাও......আমাকে কোলে নাও......

আওরংনাথ হাতের ব্যাগ রেখে তাড়াতাড়ি দেবনাথকে কোলে তুলে দেয় এবং চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয় তার কচিমুখ। চুলে-পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। স্ত্রীকে বলে-ওগো দেখো আমাদের সোনামনি কত সুন্দর! ওকে কোলে করলে বুক ভরে যায় অনাবিল শান্তিতে।

স্ত্রী হেসে বললেন-এ যে বড় আদরের ধন। নয়নের আলো, ওর জন্যই তো আমাদের এ ধনসম্পদ...

হাঁ, ঠিক বলেছো গিন্নি দেবনাথের জন্যই আমাদের সবকিছু। ওর জন্য এ বিশ্ব স্বর্গ রচনা করবো। আমাদের দেবনাথ রাজপুত্র......

গিন্নি দেবনাথকে স্বামীর কোল থেকে নিয়ে আদর দিয়ে বসলে-আয়া, ওকে একটু বাগানে নিয়ে যাও। আমি স্নান সেরে আসি। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে-চলো আজ আমরা একসঙ্গে স্নানাগারে স্নান করবো।

হাঁ চল। অনেকদিন আমরা একসঙ্গে স্নানাগারে স্নান করিনি। জামার বোতাম খুলে ফেলে আওরংনাথ।

বেরিয়ে যায় আয়া দেবনাথকে কোলে নিয়ে।

বাগানে গিয়ে বসে আয়া।

দেবনাথ খেলা করতে থাকে তার খেলনা নিয়ে।

বৃদ্ধা আয়ার দু'চোখ ভরে নেমে আসে ঘুম।

দেবনাথ পা পা করে এগিয়ে যায় গেটের দিকে। গেট ভোলা ছিলো। দেবনাথ গেট দিয়ে নেমে আসে নিচে, পথের বুকে।

ঐ মুহূর্তে একটি সন্ন্যাসীবেশী ছেলেধরা পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। দেবনাথকে দেখতে পায় সে। চোখ দুটো তার জ্বলে ওঠে লালসায়, আজ তার ভাগ্য ভাল। কদিন হলো সে এই শহরে এসেছে। আজ পর্যন্ত সন্ন্যাসীবেশী ভদ্র লাল বিফলকাম হয়নি। বাংলাদেশে সে বেশ প্রসার জমিয়ে নিয়েছিলো। প্রায় তিনশ' ছেলে সে একাই বাংলাদেশ থেকে পরিবেশন করেছে, পেয়েছে লাখ টাকা।

বাংলাদেশ থেকে সে ফিরে এসেছে ভারতে। এখানে আসার পরও বেশ কিছু মালামাল সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং সেই মালগুলো কোম্পানীর শাখাগুলোর এজেন্টদের নিকটে বুঝিয়ে দিয়ে মোটা অংক পেয়েছে। তারপর কদিন আর তেমন কোন মালামাল তার ভাগ্যে জোটেনি। বিফল মনে আস্তানায় ফিরছিলো, হঠাৎ দেবনাথ তার ভাগ্যে জুটে যায়।

ভন্দরলাল ঝোলা থেকে বের করে একটা লাল টকটকে আপেল হাসিভরা মুখে এগিয়ে আসে-এই খোকা, নেবে?

দেবনাথ সন্ন্যাসীর হাতে লাল আপেলটা দেখে এগিয়ে যায়।

সন্ন্যাসীবেশী ভদ্রলাল তুলে নেয় কোলে, তারপর আপেলটা ওর হাতে গুঁজে দেয়। একটি রুমাল বের করে চেপে ধরে নাকে, তারপর দ্রুত পায়ে চলে যায় সেখান থেকে।

*

আনন্দ আর হাসিতে মেতে উঠেছে আওরংনাথ। স্নানাগারে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটে ওরা স্বামী-স্ত্রী। প্রাণভরে স্নান করে দু'জন, তারপর স্নান সেরে আসে ঘরে।

স্ত্রী ডাকে দেব, দেব...ওগো আয়াকে ডাকোনা

আওরংনাথ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আড়চোখে নিজের চেহারাটা ভাল করে দেখে, চুল আঁচড়ানো শেষ হয়েছে। এবার খাবার টেবিলে বসবে ওরা। টেবিলে নানা ধরনের খাদ্যসম্ভার থরে থরে সাজানো। বাবুর্চি খাবার সাজিয়ে রাখছে, বয় দাঁড়িয়ে আছে হুকুমের অপেক্ষায়। টেবিলে তিনখানা প্লেট সাজানো হয়েছে প্রতিদিন তাই হয়। একটি আংনাথ, অপরটি মিসেস আওরনাথের আর মাঝে দেবনাথের স্বর্ণথালা।

আওরংনাথ বললো–বয়, আয়াকে ডাকো, দেবকে নিয়ে আসুক।

বয় ছোটে বাগানে-আয়া-আয়া, দেব, বাবুকে নিয়ে যাও, টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।

আয়া ঘুমিয়ে পড়েছিলো, বয়ের ডাকে জেগে ওঠে।

চোখ রগৃড়ে তাকায় আয়া, বিস্ময়ভরা গলায় গরায় বলে-দেববাবু তো এখানেই ছিলো। দেব বাবুদেব বাবু......

বয় দেখলো ফটক খোলা।

দু'চোখ তার ছানাবড়া হলো, ভারী ডাকলো-দেববাবু... দেববাবু... দেববাবু,

বয় ফিরে এলো, তার পেছনে আয়া। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে কাঁদতে থাকে সে।

খাবার টেবিলে বসে গেছেন আওরংনাথ ও মিসেস নাথ। অপেক্ষা করছে সোনামণির। কিন্তু একি, কোথায় দেবনাথ। আয়ার চোখে পানি, বয় কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

শূন্য থালা পড়ে রইলো, উঠে পড়লো আওরংনাথ ও মিসেস নাথ! চিৎকার করে বললো আওরংনাথ-কোথায় দেব। কোথায়, বলো আয়া কোথায় দেব?

নেই! দেববাবু নেই……

কি…কি বললে আয়া, দেব নেই! মিসেস নাথ বসে পড়লো মেঝেতে।

আওরংনাথ চিৎকার করে উঠলো-দেব নেই! কোথায় সে? কোথায়? দেব… দেবনাথ বাবা। ওরে দেব……।

বয় বললো–মালিক, আয়া ঘুমিয়ে পড়েছিলো, দেববাবু ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেছে বাইরে পথে।

বলিস কি! আমাকে গুলী কর! আমাকে গুলী কর। ছুটে বেরিয়ে যায় আওরংনাথ। একবার ফিরে ও তাকায় না সে স্ত্রীর দিকে, টেবিলে বাবা-মার রৌপ্য থালার মাঝে দেববাবুর স্বর্ণ থালা শূন্য পড়ে থাকে! টেবিলে নানাবিধ খাদ্যসম্ভার।

পথে নেমে উচ্চস্বরে ডাকে আওরংনাথ-দেবনাথ। সোনা-মণি দেবনাথ! কোথায় আমার দেবনাথ,..

ততক্ষণে তার চারপাশে লোজন জড়ো হয়ে পড়ে। সবাই স্বনামধন্য আওরংনাথকে পথে দাঁড়িয়ে উন্মাদের মত চিৎকার করে দেবনাথ দেবনাথ বলতে শুনে কিছু বুঝতে না পেরে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

আওরংনাথের সহকর্মীরা ছুটে আসে খবর পেয়ে।

সবাই তাকে জোরপূর্বক বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু কেউ তাকে নিয়ে যেতে পারে না। আওরংনাথ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকতে

থাকে, দেবনাথ, ও আমার সোনামণি দেবনাথ।

প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

পথ দিয়ে যে সব যানবাহন চলছিলো ভীড় দেখে এবং একজন মহান ভদ্রলোককে পথে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে শুনে তারা গাড়ি থামিয়ে জানতে চায় কি ব্যাপার, কি ঘটেছে এখানে। শোনার পর সবাই চলে যায় যার যার গন্তব্যপথে।

এক সময় সন্ধা ঘনিয়ে আসে।

দেবনাথের সন্ধানে লোকজন ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে। শহরের এমন কোনো জায়গা। বাকি থাকে না যেখানে দেবনাথের খোঁজ করা হয় না। বন্দরে, নগরে, বিমান বন্দরে এমন কি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে।

রাত বাড়তে থাকে।

সবাই বিমুখ হয়ে ফিরে আসে।

রজত সিংয়ের মুখও ম্লান। সেও ভেবে পায় না দেবনাথ গেলো কোথায়। সমস্ত দিন রজত সিংও গাড়ি নিয়ে আওরনাথের সহকারীদের সঙ্গে ছুটাছুটি করে দেবনাথের খোঁজ করেছে। তার চোখেও বিষন্নতার ছাপ। একটি গোলাপের কুঁড়ির মত শিশু হারিয়ে গেলো অন্ধকারের অতলে।

সে যেখানে তাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে বলছে রজত সিং সেখানেই যাচ্ছে। সমস্ত দিন তারও নাওয়া খাওয়া হয়নি।

আওরংনাথকে জোরপূর্বক বাড়ির ভেতরে আনা হয়েছে বটে কিন্তু সে ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাকে তার সঙ্গীগণ ধরে রাখে এবং সবাই সান্ত্বনা দিচ্ছে, দেবনাথ ফিরে আসবে, ভাববার কিছু নেই।

ওদিকে মহিলামহলে মিসেস নাথ মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। তার বিলাপধ্বনি বড় করুণ, বড় হৃদয়বিদারক! মহিলামহল আত্মীয় এবং বান্ধবীগণের ভীড়ে গমগম করছে। সমস্ত বাড়িতে একটা বিষাদের ঘন কালো মেঘ জমাট বেঁধে উঠেছে।

সমস্ত রাত কেটে গেলো।

কারও মুখে খাবার পড়লো না। কারও চোখে নিদ্রা নেই, সবাই ভয়ংকর এক অবস্থায় রাত কাটালো।

মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ে আওরংনাথ, পর মুহূর্তেই চিৎকার করে ওঠে- দেবনাথ। কোথায় তুই সোনামণি!

সোনামণির সোনার থালা শূন্য টেবিলে পড়ে আছে। কোথায় সেই সোনামণি!

রজত সিং বেচারীও জেগে আছে।

মালিকের এ অবস্থা তার মনে দারুণ ব্যথা সৃষ্টি করেছে। কি বলবে সে ভেবে পায় না।

ভোর হয়ে এলো এক সময়।

চিৎকার করে আওরংনাথ দেবনাথকে ডাকছে।

রুক্ষচুল, ঠোঁট দুটো বড় শুকনো, খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়েছিলো, সেই অবধি পেটে বা মুখে দানাপানি পড়েনি। কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। এক গেলাস পানি তাও চেয়ে খাবার মত সংজ্ঞা তার নেই।

তার চার পাশ ঘিরে বসে আছে তার সহকারিগণ।

রজত বললো——মালিক, সব জায়গা থেকে সবাই ফিরে এলো, কেউ কোনো সন্ধান পেলো না। আমার মনে হয় আর একটি জায়গা দেখা বা সন্ধান নেওয়া দরকার ছিলো।

আওরংনাথ বলে উঠলো–বলো রজত কোথায় সেই জায়গা? বলো রজত বলো?

কোনো দ্বিধা না করে বললো রজত-শিমূলাঘাটা কালী মন্দির। যেখানে আপনার কোম্পানীর মালামাল জমা থাকে।

সহকারীগণ সবাই রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো, এবার তারা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো।

একজন বললো–হা স্যার, রজত সিং ঠিকই বলেছে। একবার সেখানে খোঁজ নেওয়া দরকার।

আওরংনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠলো শিমলা কালীমন্দিরের গহ্বরে তার গোপন কক্ষ, সেখানে শত শত শিশুকে আটক রাখা হয় এবং পরে তাদের মস্তক ছেদন করে বিরাট হাঁড়িতে সেদ্ধ করা হয় সেই ছিন্ন মস্তকগুলো, তারপর ছুরি দিয়ে চামড়া ছাড়ানো হয়। কত অসহায় শিশুর মস্তক ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হয়......আর ভাবতে পারে না আওরংনাথ, চিৎকার করে বলে ওঠে-না না, সেখানে আমার দেবনাথ থাকতে পারে না......না, কিছুতেই আমি বিশ্বাস করি না।

আমি বিশ্বাস করি না......

সহকারীদের একজন বললো–স্যার, আমিও ভাবছি সব জায়গা খুঁজে দেখা হলো শুধু বাকি আমাদের সেই কালীমন্দির।

তবে আমাকেও তোমরা নিয়ে চলো। রজত সিং চলো বন্ধু নিয়ে চলো।

আওরংনাথ ও তার সহকারীগণ চললো শিমলাঘাটার উদ্দেশ্যে। রজত সিং গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চললো।

পথ যেন ফুরোতে চায় না।

আওরংনাথ মনপ্রাণে মা কালীকা দেবীকে স্মরণ করছে।

গোটা গাড়িখানা যে হাওয়ায় ভেসে চলেছে।

মাঝে মাঝে বলছে আওরনাথ-রজত, সিং আরও জোরে, আরও স্পীডে গাড়ি চালাও। আমি আর স্থির থাকতে পারছি না......বারবার আওরংনাথের চোখের সামনে ভাসছে সেই অসহায় শিশু গুলোর মুখ, তার দেবনাথও কি ঐ শিশুদের মধ্যে মা মা বলে কাঁদছে। দেবনাথের শরীরেও কি ধূলোবালি কাদামাটি লেগেছে। ক্ষুধায় কাঁদছে তার দেবনাথ......

এক সময় গাড়ি পৌঁছে গেলো শিমলাঘাটা কালী মন্দিরের পাশে।

রজত গাড়ি রাখতেই নেমে পড়লো আওরংনাথ। তার সহকারিগণ এবং রজত সিং নিজে।

মন্দিরের দরজা খুলে গেলো।

ভেতরে প্রবেশ করলে তারা সবাই।

আজ আর মন্দিরের দরজা বন্ধ হলো না। আওরংনাথ ও তার সঙ্গীগণ সুড়ঙ্গের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে চললো।

শিমলাঘাটা মন্দিরের প্রহরী এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ বিস্ময়াহত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা তাদের স্বনামধন্য মালিক ও তার অন্যান্য সঙ্গীকে এমন অবস্থায় দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। ব্যাপার কি হলো ভেবে পায় না।

পরে জানতে পারে তাদের মালিক আওরংনাথের একমাত্র পুত্র কোথায় হারিয়ে গেছে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত শহর বন্দর এবং বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করে না পেয়ে এখানে এসেছেন নিজ সন্তানের সন্ধানে। আওরংনাথের সন্তান কত বড়, কেমন দেখতে তারা আজও কেউ দেখেনি বা জানে না। তাদের যে কাজ সেই কাজেই ব্যস্ত সবাই, মালিক শুধু টাকা দেওয়ার মালিক, তার বাড়ির সন্ধান তারা কোনোদিন নেয়নি বা নেবার প্রয়োজন মনে করেনি।

মালিকের উদ্ভ্রান্ত চেহারা তাদের মনে অস্থিরতা আনলো।

আওরংনাথ প্রথমেই শিশুদের বন্দীকক্ষে প্রবেশ করলো। কিন্তু বন্দীকক্ষ শূন্য। আওরংনাথের চোখে ভাসছে সেদিনের সেই কচি কচি মুখগুলো-কেউ কাঁদছে, কেউ ঝিমুচ্ছে, কেউ শুকনো রুটি চিবুচ্ছে আবার কেউ মাটির মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে ঘুমাচ্ছে ....আওরংনাথ বললো–ওরা কোথায়? শিশুরা তাদের যে দেখছি না?

মধু ডোম বললো–মালিক তাদের সবাইকে কেটে ফেলা হয়েছে।

শিউরে উঠলো আওরংনাথ, ঢোক গিলে বললো–কেটে ফেলা হয়েছে?

হাঁ মালিক। মাথাগুলো সেদ্ধর জন্য মেশিনরুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইলেকট্রিক চুল্লিতে হাঁড়ি বসানো হয়েছে, আজ রাতে সেদ্ধ হবে।

কোথায়? কোথায় সেই মাথাগুলো? মধু, নিয়ে চলো সেইকক্ষে।

চলুন মালিক। কাল সন্ধ্যা রাত থেকে ভোররাত পর্যন্ত আমরা কাজ করেছি। আপনি বলেছিলেন পাঁচশ' পূর্ণ হলেই মাথা তৈরির কাজ শুরু করতে। আমরা আপনার নির্দেশমতই কাজ করছি।

সহকারি মধ্যে একজন বললো–কোথায় সেই ছিন্ন মস্তকগুলো?

ইলেকট্রিক চুল্লিকক্ষে। বললো একজন কর্মচারী।

ঐ ইলেকট্রিক চুল্লিকক্ষে মাথাগুলো সেদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন হয়।

রজত সিং সব দেখছে আর শুনছে, সবই তার কাছে নতুন এক অধ্যায়।

আওরংনাথ তার সঙ্গীদেরসহ চুল্লিকক্ষে প্রবেশ করলো। থরে থরে সাজানো মাথাগুলো কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। এক একটি চুল্লিতে পঞ্চাশটি করে মাথা সেদ্ধ হয়। তাই এক একটি জায়গায় পঞ্চাশটি করে মাথা কালো কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

আওরংনাথ ক্ষিপ্রহস্তে একটি কালো কাপড় তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো। অমনি বের হচ্ছে এক একটা মর্মান্তিক দৃশ্য। বড়ই করুণ আর ভয়ংকর। কচি নিষ্পাপ শিশুদের ছিন্ন রক্তমাখা মস্তক। কোনো কোনো শিশুর মস্তক দেখলে মনে হচ্ছে, অসহায় করুণ চোখে সে তাকিয়ে আছে।

আওরংনাথ এমন বহু মস্তক দেখেছে কিন্তু আজ তার বুক কেন এমন করে কাঁপছে। হাত আরষ্ট হয়ে আসছে, হঠাৎ যদি তার দেবনাথের মাথা বেরিয়ে আসে তা কি সহ্য করতে পারবে সে! আওরংনাথ এবার উন্মাদের মত চতুর্থ স্তরের মস্তকগুলোর কালো কাপড়ের ঢাকনা সরিয়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো আওরংনাথ-দেবনাথ এ যে দেবনাথের মাথা......পাগলের মত মাথাটা তুলে নিলো আওরংনাথ। বুকে চেপে ধরে চিৎকার করে বললো–পেয়েছি। আমার দেবনাথকে পেয়েছি......সোনামণি, তুমি এখানে আর আমরা তোমাকে খুঁজে ফিরছি সারা শহরে, নগর বন্দর সব স্থানে......আর পালাতে পারবে না......

তোমার খাবার টেবিলে সাজানো আছে। চলো দেববাবু, আমার দেবনাথ, চলো : তোমার মা তোমাকে খুঁজছে......আওরংনাথ আরও গভীরভাবে দেবনাথের মাথাটা বুকে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সবাই থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এমন দৃশ্যও তাদের দেখতে হলো! কি ভীষণ পরিণতি আওরংনাথের!

এবার আওরংনাথ দেবনাথের ছিন্ন মস্তক নিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে। সন্তানের ছিন্ন মস্তকের রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো তার জামাকাপড়। শুধু বলছে, আমার দেবুকে পেয়েছি আর সে হারিয়ে যাবে না......হারিয়ে যাবে না...... না না না......

সহকারীদের একজন বললো–কে এই ছেলেটি তোমাদের হাতে এনে দিয়েছিলো বলতে পারো?

মধু ডোম বললো–পারি। আমাদের বহুদিনের পুরানো সাপ্লাইম্যান ভন্দরলাল।

অপরজন বললো–ব্যাটা ভাল মাল জোগাড় করতো। পয়সাও কামাতো ভালো। শেষ পর্যন্ত মালিকের ছেলেকে সে চুরি করে আনলো।

অন্য আর একজন বললোভন্দরলাল জানতো না ওটা মালিকের ছেলে। জানলে এমন ভুল হতো না। এখন কি হবে স্যার?

এবার রজত সিং বললো–হবে আর কি! এতদিন ধরে আওরংনাথ শত শত মা-বাবাকে কাদিয়ে যে আনন্দ পেয়েছিলো এবার তাদের ব্যথা কেমন তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করবে। তোমাদের একটিকেও রেহাই দেবো না, কারণ তোমাদের সহযোগিতায় আজ আওরংনাথ ধনকুবের, আর আজ সে সন্তান হারিয়ে উন্মাদ, তোমরা সবাই তার লোভ-লালসা আর পশুত্বে ইন্ধন যুগিয়েছিলে,..

সহকারীদের চোখেমুখে বিস্ময়, বীরেন্দ্রনাথ বললো–রজত সিং তুমি ড্রাইভার। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি, আর তুমি আমাদের ব্যবসাকে নিন্দা করছো?

কথা শেষ হয় না বীরেন্দ্রনাথের।

রজত সিং রিভলভার বের করে গুলী ছুঁড়লো তার বুক লক্ষ করে। আর্তচিৎকার করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো বীরেন্দ্রনাথ। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাতে গেলে অন্য সবাই।

রাঘব ডোম বললো–আমরা গরিব, আমাদের গুলী বিদ্ধ করে হত্যা করো না রজত বাবু।

বাবু নই, রজত ড্রাইভার।

বীরেন্দ্রনাথ তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। রজত সিং বললো–শুনে যাও বীরেন্দ্রনাথ, রজত সিং নই-আমি দস্যু বনহুর।

কাতর কণ্ঠে বললো বীরেন্দ্রনাথ-তুমি…তুমিই দস্যু বনহুর…

ড্রাইভার রজত সিং বেশী বনহুর বললো–হা আরও শুনে যাও। তোমাদের কেউ জীবিত অবস্থায় শিমলাঘাটা কালী মন্দিরের বাইরে যেতে পারবে না। আমি ডিনামাইট বসিয়ে দিয়েছি……তোমরা একজনও রেহাই পাবে না। লক্ষ লক্ষ শিশু হত্যাকারী নরপিশাচ তোমরা, তোমরা বাঁচতে পারো না……তবে হাঁ, আওরংনাথকে আমি এত সহজে হত্যা করতে চাই না, কারণ মৃত্যুর পর তার সব জ্বালা মুছে যাবে। তাই তাকে আমি জীবিত রাখতে চাই……যাও আওরংনাথ, তোমার দেবনাথের মাথাটা নিয়ে তুমি বেরিয়ে যাও। তোমার পথ মুক্ত……

উম্মাদ আওরংনাথ দেবনাথের রক্তমাখা মাথাটা নিয়ে বিকটস্বরে হাসতে থাকে। সেই হাসি যেন থামতেই চায় না, বললো, বনহুর–আওরংনাথ, যাও তুমি বেরিয়ে যাও। আজ তুমি অনুভব করো হাজারো বাবা-মায়ের কি দারুণ ব্যথা। সন্তান হারানোর কেমন জ্বালা। যাও বেরিয়ে যাও আওরংনাথ, তোমার দেবনাথকে নিয়ে যাও……অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে।

আওরংনাথের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার জন্য তার সহকারী পার্টনারগণ এবং নিম্ন শ্রেণীর যারা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিলো তারাও তাড়াহুড়া করে পা বাড়ালো।

বনহুর তার দুহাতে দু’খানা রিভলভার উদ্যত করে ধরে বললো–খবরদার, এক পা এগুবে না, তাহলে গুলী করে মারবো যেমন তোমাদেরই একজন বীরেন্দ্রনাথকে হত্যা করেছি…..

কথাটা বলে বনহুর দ্রুত বেরিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে শিমলাঘাটা কালী মন্দিরের দরজা বন্ধ নেই ভেতর থেকে মন্দিরের দরজা খোলা। বনহুর হাতঘড়ির দিকে তাকায়, তারপর তাড়াতাড়ি মন্দিরের সামনে দন্ডায়মান আওরংনাথের কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের নতুন ঝকঝকে গাড়িখানায় চেপে বসে। রজত সিং নামে প্রথম হতেই বনহুর এ গাড়িখানা চালিয়ে এসেছে। গাড়িখানার ওপরে একটা মায়া বসে গেছে বনহুরের। বনহুর বারবার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। এখনও তার শরীরে শিখ ড্রাইভারের ড্রেস। মাথায় পাগড়ি, মুখে গাড়ি-গোঁফ, দক্ষিণ হাতে লৌহবলয়, চোখে কালো চশমা।

গাড়িতে স্টার্ট দিতেই দেখলো বনহুর একটা লোক-শরীরে সন্ন্যাসীর পোশাক দৌড়াতে দৌড়াতে এদিকে আসছে। বনহুরের গাড়ির পাশে এসে সে বললো– মালিক কোথায় ড্রাইভার?

কেন, কি দরকার তার? কে তুমি? বললো রজত সিং-বেশী ড্রাইভার।

সন্ন্যাসী বেশধারী ব্যক্তিটি বললো–আমি সুন্দরলাল। গত পরশু একটা মাল দিয়ে গেছি, তার দাম আজও পাইনি। আমি শুনলাম মালিক এখানে এসেছে, তাই দামটা নিতে এলাম।

বনহুরের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো, এই সেই ব্যক্তি যে বহুকাল ধরে আওরংনাথের কোম্পানীতে মাল পরিবেশন করে আসছে। এই সেই ভন্দরলাল! নরপশু নর-ঘাতক জল্লাদ বনহুর গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায়- ভন্দরলাল তুমি একটি মালে কত টাকা পাও?

ড্রাইভার তুমি দিতে পারবে আমার টাকাটা?

পারবো।

ভাই, তাহলে ভালই হয় মালিকের সঙ্গে দেখা করার দরকার হবে না। একটি মালে কত পাই জিজ্ঞাসা করছিলে? একটি মালে দু'হাজার পাই। একটি মাল জোগাড় করতে অনেক কষ্ট…

বনহুর পকেটে হাত প্রবেশ করালো।

লালসাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ভন্দরলাল ড্রাইভারের হাতের দিকে।

ড্রাইভার হাত বের করলো বটে তবে হাতে টাকা নয় রিভলভার। কিছু পূর্বে ঐ রিভলভারের গুলীতে বীরেন্দ্রনাথকে বনহুর পরপারে পাঠিয়েছে। এবার সে ভন্দরলালের বুক লক্ষ্য করে বললো–ছেলে ধরা হিসাবে অনেক সুনাম করেছে, এটা তারই পুরস্কার……

বনহুরের কথা শেষ হতে না হতে তার হাতের রিভলভার থেকে গুলী বেরিয়ে আসে।

সন্ন্যাসীবেশী ভন্দরলাল কিছু বলতে গেলো কিন্তু তার কথা শেষ হলো না, মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

বনহুর দ্রুত গাড়ি নিয়ে শিমলাঘাটা কালী মন্দির ছেড়ে দূরে সরে চললো। বেশ কিছুদূর আসার পর পেছনে শুনতে পেলো প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ। বনহুর ফিরে তাকিয়ে দেখলো শিলাঘাটা ধূম্ররাশিতে ভরে উঠেছে। চারদিক অন্ধকার লাগছে বনহুরের বানিয়ে দেওয়া ডিনামাইট বাক্ত হয়েছে।

সামনে তাকাতেই শুনতে পেলো বনহুর অট্টহাসির শব্দ। ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে পারলো আওরংনাথ তার শিশুপুত্র দেবনাথের ছিন্ন মস্তকটা বুকে জড়িয়ে দৌড়াচ্ছে। কখনও বা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার কখনও উঠে দাঁড়িয়ে ছিন্ন মস্তকটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে বারবার চুমো খাচ্ছে,

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠলো।

গাড়ি নিয়ে বিমান বন্দরের দিকে এগুলো বনহুর। হাতঘড়িটা আর একবার দেখে নিলো। আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, এর মধ্যে তাকে বিমান বন্দরে পৌঁছতে হবে। বিমানের টিকিটখানা তার পকেটে আছে। ঠিক সময়মতই সব কাজ সমাধা হয়েছে, শুকরিয়া আল্লাহর দরবারে।

[পরবর্তী বই লৌহমানব ও বনহুর]